বাংলার নব্যসংস্কৃতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

সূচীপত্র

পূর্বাভাষ

নব্যসংস্কৃতি বলিতে কি বুঝাইতে চাই সে সম্বন্ধে দু-চার কথা আরম্ভেই বলা প্রয়োজন। বাংলা দেশ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আসে। কিন্তু নানা কারণে পশ্চিমের শিক্ষাব্যবস্থা তখন আমাদের মধ্যে প্রচলিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেশবাসীরা বাণিজ্য, বিচারাদালত ও অন্যান্য কর্মব্যপদেশে শাসক-জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির অবকাশ পায়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পাশ্চাত্য দেশসমূহকে কতখানি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছে, লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত পত্রে রাজা রামমোহন রায় তাহার উল্লেখ করেন। বাঙালী-প্রধানেরাও এ বিষয়টি বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা ইউরোপীয়দের সহযোগে পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং নূতন শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তনে অগ্রণী হন। হিন্দু কলেজ, রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দুস্কুল, কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং মণ্ডলী স্থাপনের মধ্যেই তাঁহাদের প্রাথমিক প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়।

নব্যশিক্ষা তথা নব্যশিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পশ্চিমের ভাবধারার সঙ্গেও বাঙালী সন্তানেরা ক্রমশ পরিচিত হন। তাঁহারা সংঘবদ্ধ ভাবে মানবকল্যাণকর এবং দেশের মঙ্গলপ্রসূ বিবিধ কার্যে যত্নপর হইলেন। সংঘবদ্ধ প্রয়াস স্বল্পসময়ে কত অধিক ফলপ্রসূ হয় তাহার দৃষ্টান্তও তাঁহাদের সম্মুখে কম ছিল না। কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির বয়স তখন চল্লিশের কোঠায়। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয়গণ কর্তৃক কৃষি ও উদ্যান -রচনা সমাজ,

চিকিৎসা এবং পদার্থবিদ্যা আলোচনা সভা কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন রায় ১৮১৪ খৃস্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে বসবাস শুরু করিয়া ধর্মালোচনার নিমিত্ত পর বৎসর 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন। এ সমুদয় সভাসমিতির কার্যকলাপও নব্যশিক্ষিতেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ড. এফ. জে. মৌএট ইহার সূচনায় বলিয়াছিলেন যে, স্কুল-কলেজে পড়িয়া মানুষ মাত্র অর্ধেক শিক্ষালাভ করে। সংঘবদ্ধ বা 'সমাজ'-বদ্ধ ভাবে আলাপ-আলোচনা-বিতর্কের মাধ্যমেই আমাদের শিক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। নব্যশিক্ষার প্রাক্কালে সভাসমিতির বাহুল্য ঘটেও প্রধানত এই কারণে।

আর-একটি কারণেও বাঙালী-প্রধানেরা ঐ সময়ে সংঘবদ্ধ হইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সাধারণভাবে খৃস্টীয় সমাজ এবং বিশেষ ভাবে খৃস্টান পাদ্রীগণ তখন ভারতবাসীদের আচার-আচরণ, সমাজ-ব্যবস্থা, পূজার্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রতিবাদে পুস্তক রচনা ও পত্রিকা প্রকাশিত করেন। কিন্তু একক চেষ্টায় ইহার প্রতিরোধ সম্ভব নয়। একটি প্রতিষ্ঠান সমবেতভাবে উহার বিরুদ্ধে কর্মতৎপর হইয়া উঠে। ইহার কর্তৃস্থানীয়েরা সাহিত্যচর্চা ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ দ্বারাই এই অপচেষ্টা ব্যাহত করিতে লাগিয়া যান। কিন্তু এসকল বিষয় আলোচনার পূর্বে আর-একটি কথাও এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত কয়েকটি সোসাইটি বা প্রতিষ্ঠানের কথা— যাহা এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছি— এখানে আলোচিত হইবে না। আবার, ধর্ম ও রাজনীতি -ভিত্তিক সভাসমিতির আলোচনার ক্ষেত্রও ইহা নহে। এ কারণ একদিকে যেমন এশিয়াটিক সোসাইটি, কৃষি-সমাজ প্রভৃতি, অন্যদিকে তেমনি 'আত্মীয়সভা' 'ব্রহ্মসভা' 'ধর্মসভা' এবং 'জমিদার সভা' প্রভৃতির

কথা এখানে বলিব না। হিন্দুমেলা[১] নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হইলেও ইহার আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিব। বর্তমানে শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এইসব বিষয়ের সঙ্গে যেসকল প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, এই ধরনের সভা সমিতি বা সমাজের কথা বিশেষ করিয়া বলা হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে বাঙালী জীবনে সাহিত্যসংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতির প্রভাব অপরিমেয়। নব মহাজাতি গঠনে এইসকল সভা-সমিতির গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখানে সংক্ষেপে মাত্র প্রধান প্রধান সভা-সমিতির কথাই আলোচিত হইবে।

গৌড়ীয় সমাজ

প্রথমেই আমরা গৌড়ীয় সমাজের কথা বলিব। 'সমাজ' কথাটি সে সময়ে ইংরেজী 'Society' 'Institution' বা 'সভা' 'সমিতি' বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। গৌড়ীয় সমাজে হিন্দু কলেজ ও অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে শিক্ষিত কোনো কোনো যুবক এবং ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন প্রবীণেরা সম্মিলিত হন। সে-যুগের কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-প্রধানও ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও শিবচরণ (বা, চন্দ্র ?) ঠাকুর।[২] প্রবীণদের মধ্যে দেখি রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতিকে। পণ্ডিতগণের মধ্যে ছিলেন রামজয় তর্কালংকার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিদ্যালংকার। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আরও বহু

১ 'হিন্দুমেলা' সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা লেখকের "জাতীয়তার নবমন্ত্র" পুস্তকে দ্রষ্টব্য

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা।

গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁহারা নিজেরা সুপণ্ডিত নহেন কিন্তু গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী আসিয়া সমাজের সঙ্গে যোগ দিলেন।

গৌড়ীয় সমাজের[১] প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় ১৮২৩ খৃস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। ইহার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। একখানি অনুষ্ঠানপত্রও রচিত হয়। এই দিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেন সুবিজ্ঞ সাহিত্যিক রামকমল সেন। তাঁহার আহ্বানে পূর্বলিখিত অনুষ্ঠানপত্রখানি পাঠ করিলেন পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালংকার। গৌড়ীয় সমাজ যে একটি পুরাপুরি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এ কথা অনুষ্ঠানপত্রে স্পষ্ট করিয়া বলা হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল। যথাযথ জ্ঞানই যে সর্বশক্তির মূলাধার এ কথা অতিশয় জোরের সঙ্গে বলা হইয়াছে। সংঘবদ্ধ ভাবে কার্য করিলে স্বল্প-সময়ে কত অধিক ফল লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে অনুষ্ঠানপত্রখানি এই মর্মে বলেন—

"স্বদেশের হিতসাধনের জন্য এরূপ বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক যাহা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা এককভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বহু জনের সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন। আর এ প্রকার সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে ইতিপূর্বে বহু জনহিতকর কর্ম সাধিত হইয়াছে। সভাসমিতির দ্বারা কত মহৎ কার্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে সুসম্পাদিত হইতে পারে, ইউরোপীয়দের সভাসমিতিগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১ গৌড়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানপত্র নিয়মাবলী; এবং। অধ্যক্ষ-সভার বিষয় ইংরেজীতে The Oriental Review নামক স্থানীয় একটি পত্রিকায় বাহির হয়। লণ্ডনস্থ The Asiatic Journal, December 1823 ৫৪৯-৫৮ পৃষ্ঠা) এ সকল উদ্ধৃত করেন। ইহা হইতে তথ্যাদি গৃহীত হইয়াছে।—লেখক

"একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যখন অনেকে সংঘবদ্ধ হয়, তখন খুব কম কাজই অসাধ্য থাকে। বহুজনের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অর্থের সমাবেশ হইলে একটি অদ্ভুত শক্তি জন্মে। এই শক্তি দ্বারা সকলেই সমভাবে লাভবান্ হইতে পারেন। একক চেষ্টায় এরূপ শক্তিলাভ সম্ভব নয়, উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইয়া বরং দূরেই থাকিয়া যায়।"

প্রাচীন বাংলা, ফার্সি, আর্বি, সংস্কৃত, এমনকি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে প্রসারলাভ করিবে না। এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু বাংলা ভাষায় মৌলিক পুস্তক রচনা ; কিন্তু তখনই ইহা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কাজেই অনুষ্ঠানপত্রে বলা হইয়াছে, আলোচ্য সমাজ বা সাহিত্যপ্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষা হইতে জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি অনুবাদ বা সংকলনের নিমিত্ত যোগ্য পণ্ডিতদের নিযুক্ত করিবেন। আর অনুবাদ বা সংকলন -পুস্তক প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নামে প্রকাশিত হইবে। এই উপায়ে আবিলম্বে এমন এক প্রস্ত পুস্তক রচিত হইবে যাহা দ্বারা বাংলাভাষী আপামরসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। অনুষ্ঠানপত্রে আর-একটি বিষয়ের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। খৃস্টানী অপপ্রচার প্রতিহত করার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থাদির সংকলন ও অনুবাদ -প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হইয়াছে। গৌড়ীয় সমাজ এ বিষয়টির ভারও গ্রহণ করিবেন, এরূপ বলা হয়।

অনুষ্ঠানপত্রে প্রস্তাবিত বিষয়াদির নিরিখে সমাজের উদ্দেশ্য এবং নিয়মাবলী নিম্নরূপ নির্ধারিত হয়—

"১। মান্যগণ্য সুবিজ্ঞ দেশীয়দের লইয়া একটি সমাজ গঠিত হউক।

২। দেশবাসীদের ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন ভাষা হইতে বাংলা ভাষায়

গ্রন্থাদি অনুবাদ করাইয়া সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করিতে হইবে।

৪। দেশবাসীর মধ্যে নীতি এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমন ও নিরোধকল্পে সমাজ যত্নপর থাকিবেন।

৫। এ উদ্দেশ্যে সমাজের ব্যয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে।

৬। প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি লইয়া একটি গ্রন্থাগার গঠন করা যাইবে।

৭। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হইবে।

৮। আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইলে গৌড়ীয় সমাজের জন্য একটি ভবন ক্রয় করা হইবে। যতদিন পর্যন্ত তাহা সম্ভব না হয়, ততদিন হিন্দু কলেজগৃহে সমাজের অধিবেশন হইবে।"

গৌড়ীয় সমাজ কিরূপ মহৎ ও ব্যাপক উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয় উক্ত নিয়মাবলী হইতে তাহা বুঝা যায়। সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ২৩শে মার্চ ১৮২৩ তারিখে। এদিনকার সভায় দুইটি আবশ্যক কার্য নিষ্পন্ন হয়। প্রথমে নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি অস্থায়ী অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল: লাডলিমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীকান্ত ঘোষাল, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালংকার, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও কাশীনাথ মল্লিক। সম্পাদক-পদে নিযুক্ত হন রাম-কমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্য— একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন। সভাস্থলেই এককালীন চাঁদা দুই হাজার টাকার উপর পাওয়া গেল। ত্রৈমাসিক চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় দুই শত চৌষট্টি টাকার। অনুষ্ঠানপত্রখানি এ অধিবেশনে পুনরায় পঠিত ও আলোচিত হইল। ইহা কিন্তু ইতিপূর্বেই মুদ্রিত করিয়া হিন্দু-প্রধানদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সুবিখ্যাত

পণ্ডিতবর্গ, ইংরেজী শিক্ষিত, সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সভায় উপস্থিত থাকিয়া সমাজের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

ইহার পর গৌড়ীয় সমাজের চারিটি অধিবেশনের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে জানা যাইতেছে। ইহার প্রথমটি হয় ১২ই মে ১৮২৩ তারিখে। এই দিবসে ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষালের পুত্র কালীশংকর ঘোষালের 'ব্যবহারমুকুর' নামক বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ পঠিত হয়। ইহার আর দুইটি অধিবেশন হইল যথাক্রমে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাটীতে এবং ভূকৈলাসের প্রসিদ্ধ ঘোষাল-ভবনে। চতুর্থ অধিবেশন হয় ২৬শে জুন ১৮২৪ তারিখে। এই দিবসের অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও স্থির হয় যে, অল্পদিনের মধ্যে বেদপাঠ আরম্ভ হইবে।[১] ইহার পর গৌড়ীয় সমাজের বিষয় আর জানা যায় না। কিন্তু এই সমাজ যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল তাহার গুরুত্ব পরবর্তী কালে নানা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত প্রয়াসের মধ্যে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি। বাংলার গদ্য সাহিত্য তখন শৈশব অতিক্রম করিয়া সবে কৈশোরে উপনীত হইয়াছে। এই সময় জ্ঞানবিজ্ঞান-অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া গৌড়ীয় সমাজ যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহাতে সুফল ফলে। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার দশ-পনর বৎসরের ভিতরেই বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বিজ্ঞানপত্রিকা, এবং ইতিহাস, ব্যাকরণ, অভিধান, মানচিত্র সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতির প্রবাহ এই সময় যে শুরু হইয়াছিল তাহা কখনও অবরুদ্ধ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর প্রবল আকার ধারণ করে। হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় যুগের নব্যশিক্ষিত যুবকগণ

[১] "সংবাদপত্রে সেকালের কথা," ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১২-১৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য

এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা যে-সব আলোচনা ও বিতর্কসভা স্থাপন করেন তাহাতে সাময়িকভাবে বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা ব্যাহত হইলেও ক্রমে ইহা সবিশেষ প্রেরণাই লাভ করে।[১]

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন

এই যুগের নব্যশিক্ষিত যুবকদের প্রতিষ্ঠিত সভাসমিতির মধ্যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনই সর্বপ্রথম, এবং সর্বাধিক গুরুত্বসম্পন্ন। কলেজের প্রথম যুগের কয়েকজন ছাত্র গৌড়ীয় সমাজের সঙ্গে একান্ত ভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ প্রকাশে সহায়তা করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী ১৮২৭ সনে বাংলা-ইংরেজী অভিধান সংকলন করেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা পণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সাহায্যে তারাচাঁদ-কৃত ইংরেজী অনুবাদসহ মূল মনুসংহিতার প্রকাশ আরম্ভ হইল ১৮৩২ সনে। কিন্তু দ্বিতীয় যুগের কলেজীয় যুবকেরা বিতর্কসভা মারফত একেবারে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচারে উদ্বুদ্ধ হন। ইহার হেতু সম্বন্ধে এখানে একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি।

হিন্দু কলেজ ১৮২৬ সনের ২রা মে কলিকাতা গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে নূতন গৃহে চলিয়া আসে। এই দিবসে হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কলেজের চতুর্থ শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি মাত্র অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক। কবি, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবী রূপে তিনি ঐ সময়েই সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ডা. হোরেস হেম্যান উইলসন

১ বর্তমান লেখকের "গৌড়ীয় সমাজ", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা, প্রবন্ধে এই সমাজ-বিষয়ক বিস্তৃততর আলোচনা আছে।

হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার সাধন করেন। এই সময়ে কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর সংযোগস্থাপন সত্যসত্যই এক নবযুগের সূচনা করিল। দুই বৎসরের মধ্যেই ইহার সুফল ফলে। ডিরোজিও ছাত্রদের সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াইতেন। কিন্তু তৎকালীন যুক্তিসিদ্ধ পাশ্চাত্য দর্শনেও তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলেজের ক্লাসে, বিশ্রাম-কক্ষে, এবং ছুটির পরেও নিজ ভবনে ডিরোজিও ছাত্রদের সঙ্গে পাঠ্য এবং পাঠ্যাতিরিক্ত নানা বিষয়েই আলাপ-আলোচনায় রত থাকিতেন। এইসব আলোচনার প্রত্যক্ষ ফল— অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামক অভিনব বিতর্ক-সভা।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নব্যশিক্ষিত ছাত্রদের প্রথম বিতর্ক-সভা; ইহাকে আধুনিক কালের বিতর্ক-সভার মত বিবেচনা করিলে ভুল করা হইবে। কারণ এখানে ছাত্রগণ যে অনুপ্রেরণা লাভ করেন তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। একটু পরেই তাহা আমরা দেখিতে পাইব। সমসাময়িক প্রমাণে বুঝা যাইতেছে, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ১৮২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে ১৮২৮ সন পর্যন্ত দু-তিন বৎসরের বিবরণ প্রদত্ত হয়। ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুব-ছাত্রগণ সোসাইটি বা ক্লাব স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। হিন্দু কলেজে সোসাইটি-প্রেরিত ছাত্রগণ পাঠোৎকর্ষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। উক্ত বিবরণে এই সকল ছাত্রের কথাও বলা হইত।[১] ইহার প্রায় তিন বৎসর পরে ১৮৩০ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত একটি বিবরণে অ্যাসোসিয়েশন যে ঐ বৎসরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার স্পষ্টতর উল্লেখ পাই।

---

১ "...They have formed societies amongst their friends at some of which they debate and read essays of their own composition on literary subjects, and at others read and study English books and translate into Bengalee."

হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ ডিরোজিওর উপদেশেই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ইহার সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন ডিরোজিও, এবং সম্পাদক হন উমাচরণ বসু। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন হিন্দু কলেজের তৎকালীন ছাত্র এবং পরবর্তী কালের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি, যথা, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, শিবচরণ দেব এবং আরো অনেকে। কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এবং তাঁহার শিক্ষাদান শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথমে সভার অধিবেশন হইত ডিরোজিওর লোয়ার সারকুলার রোডস্থিত বাসভবনে। পরে, হিন্দু কলেজের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলা বাগানবাড়ীতে (এখন যেখানে ওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন স্ট্রীট রহিয়াছে) সভা স্থানান্তরিত হয়। ডেভিড হেয়ার সভার অধিবেশনে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, বিশপস্ কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিল, পরবর্তী কালের বাংলার ডেপুটি গবর্নর ডবলিউ. ডবলিউ. বার্ড, বড়লাট বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্নেল বীটসম সভার অধিবেশনগুলিতে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইতেন এবং যুব-ছাত্রদের বিতর্কে উৎসাহ দিতেন। বিতর্কের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল যুক্তি। পক্ষান্তে একবার করিয়া অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন হইত। যুক্তিসিদ্ধ বিষয় ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রস্তাবের অবতারণা করা হইত না। আলোচনা বা বিতর্ক নিয়ত নিয়ন্ত্রণ করিতেন সভাপতি ডিরোজিও।

নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষা মত দেশের ও সমাজের হিতকর নানা বিষয়ই এখানকার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডিরোজিওর জীবনীকার অ্যাসোসিয়েশনের আলোচ্য বিষয়সমূহের একটি ফিরিস্তি দিয়াছেন।

ইহার মধ্যে আমরা পাই— স্বাধীন ইচ্ছা, অদৃষ্ট, প্রত্যয়, পবিত্র সত্য, গুণাবলী-অনুশীলনে মহান্ কর্তব্য, পাপের নীচতা, স্বদেশপ্রেমের মহত্ত্ব, ঈশ্বরের গুণনিচয়, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি, পৌত্তলিকতার অসারতা, এবং যাজনিক ব্যবস্থার ঘৃণ্যতা। এইসকল বিষয়ের আলোচনায় যুবক-মনে যুগপৎ প্রেরণা ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়।[১] ছাত্রগণ কার্যতঃ যেসকল আচরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে হিন্দু-সমাজ আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। খাদ্যাখাদ্যে অনাচার, শ্রেণীভেদে অনাস্থা, সামাজিক রীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা এবং প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থার প্রতি অনাসক্তি একদিকে যেমন নূতন যুগের সূচনা করিল অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল সমাজে একটা আলোড়ন উপস্থিত করিল। হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভা ছাত্রদের এইসকল গর্হিত কার্য হইতে বিরত করাইবার জন্য ছাত্র এবং শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে নূতন নূতন নিয়ম জারি করিলেন।

সভাপতি ডিরোজিওকে পুরোভাগে রাখিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য যুব-ছাত্রদল ১৮৩০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে 'পার্থেনন' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক বাহির করিলেন। ঐ সময়কার কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয়ের (যথা—ভারতবর্ষে ব্রিটিশের স্থায়ীভাবে বসবাস, বিচার-আদালতে অনাচার-অবিচার এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা) আলোচনা ছিল।

---

১ "Free-will, fore-ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the argument for and against the existence of deity as these have been set forth by Hume on the one side, and Reid, Dugald Stewart and Brown on the other, the hollowness of idolatry and the shams of the priesthood were subjects which stirred to their very depths the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindoo youths of Calcutta..."—*Henry Derozio*, by Thomas Edwards, p. 32, 1884.

কলেজের অধ্যক্ষ-সভা ছাত্রদের রাজনীতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা সহ্য করিতে পারিলেন না। সহ-সভাপতি ড. উইলসনকে দিয়া দ্বিতীয় সংখ্যা 'পার্থেনন' ছাপা হইলেও উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। এবম্বিধ স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং আচার-আচরণ প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী হওয়ায় ছাত্রদের বিশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হয়; কলেজ-কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে শেষ পর্যন্ত কলেজ হইতে অপসারণ করিলেন (২৫শে এপ্রিল ১৮৩১)। কিন্তু তখন সমাজে নূতন ভাবধারা প্রবর্তনের যে সূচনা হইল তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ়ীভূতই হইতে লাগিল। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ যুব-সদস্যগণ পরে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৪৩ সংখ্যায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'স্পেকৃটেটর' লেখেন—

"উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম২ রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য প্রীতি তাবদ্‌বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে, তদ্দৃষ্টে সকলেরই অনুমান হইয়াছিল, হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতিবর্ত্ম শীঘ্রই পরিবর্তন হইবেক…।"

ডিরোজিওর শিক্ষা এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আলাপ-আলোচনা ডিরোজিও-শিষ্যদের জীবনে বিশেষ প্রেরণা দান করে নিঃসন্দেহ। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র নিজ নিজ রচনায় ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। রামতনু লাহিড়ীর বৃদ্ধ বয়সের দিনলিপি আমি দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি বহুস্থলে "Derozio, O my Guru" এইরূপ লিখিয়াছেন। যুব-ছাত্রগণ নানা ভাবে শিক্ষা ও সমাজ সেবায় অবহিত হইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি অনেকে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেহ কেহ সংবাদপত্র-পরিচালনায়

মনোযোগী হন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'দি এন্‌কোয়ারার' নামে ইংরেজী সাপ্তাহিক বাহির করেন (১৭ই জুলাই ১৮৩১)। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ও পরে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সম্পাদনায় 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র প্রকাশিত হইল (১৮ই জুন ১৮৩১)। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহযোগে ইহার দশ বৎসর পরে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামে আর-একখানি প্রথমশ্রেণীর দ্বিভাষিক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির করেন (এপ্রিল ১৮৪২)। প্যারীচাঁদ মিত্র বাংলা সাহিত্যের সেবায় একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। রাধানাথ শিকদারের সহযোগে তিনি স্ত্রীপাঠ্য 'মাসিক পত্রিকা' কয়েক বৎসর যাবৎ সম্পাদনা করিয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ী শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। রামগোপাল ঘোষ ব্যবসা-কর্মে নিযুক্ত হইলেন। সরকারী দায়িত্বপূর্ণ পদেও কেহ কেহ নিয়োজিত হন। এইরূপে তাঁহারা বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত থাকিয়া বাঙালীর নানা অপবাদ ক্ষালনে সক্ষম হইলেন। "কলেজের ছেলেরা সত্যপ্রিয় ও সৎ, তাঁহারা সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু"— এইরূপ কথা তখন প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শে ও প্রেরণায় তখন কলিকাতার অন্যান্য শিক্ষায়তনের ছাত্রেরাও কতকগুলি বিতর্ক-সভা স্থাপন করেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এইসকল সভার অধিবেশন হইত; সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং কখনো কখনো রাজনীতি সম্পর্কেও এসব স্থলে আলোচনা চলিত। এইসকল সভার সদস্য-সংখ্যা ছিল সত্তর হইতে পঞ্চাশের মধ্যে। সভায় কোনো কোনো সভ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, আর পঠিত প্রবন্ধের উপরেই আলোচনা চলিত। তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজে ডিরোজিওর খুবই প্রতিপত্তি ও সুনাম। তিনি অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তো ছিলেনই, উপরন্তু অন্যান্য

সভায়ও তিনি উপস্থিত থাকিতেন এবং ছাত্রগণের আলোচনা-বিতর্ক -নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করিতেন। তিনি ডেভিড হেয়ারের পটলডাঙা স্কুলে (যাহা পরে 'হেয়ার স্কুল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে) সপ্তাহে সপ্তাহে এক প্রস্ত বক্তৃতা দেন। শুধু হিন্দু কলেজ নহে, অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরাও তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। এই সময় সভাসমিতির এত ধুম পড়িয়া যায় যে, ছাত্র ছাড়া বয়স্কেরাও সভা বা সংঘ স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। শুধু বাংলা সাহিত্য-চর্চার জন্য এইরূপ দু-তিনটি সভা তখন কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।[১] পরবর্তী কালে এই সময়কে যে 'ডিরোজিও-যুগ' বলা হইত তাহা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নহে।[২]

কলেজ হইতে ডিরোজিওর অপসারণ এবং তাহার অল্প কাল পরে মৃত্যু (২৬শে ডিসেম্বর ১৮৩১) হেতু অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বা অন্যান্য সভাসমিতি তাঁহার সদুপদেশ হইতে বঞ্চিত হইল। তবে এই সময়ে যে সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রচেষ্টার প্রাবল্য ঘটে, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ স্তিমিত হইলেও তাহা সক্রিয় হইয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ১৮৩৯ সনের গোড়ার দিকে উঠিয়া যায়। কিন্তু ইতিপুর্বেই হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ও তৎকালীন ছাত্রগণ একাধিক সভা স্থাপনে তৎপর হইয়া উঠেন। পূর্বের ন্যায় বয়স্কেরাও সাহিত্যমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। এইসকল বিষয়ই এখন পর পর বলিতেছি।

১ ১১ই ডিসেম্বর ১৮৩০ সংখ্যক 'জন বুল'-এ প্রকাশিত একটি বিবরণ হইতে এই সকল তথ্য গৃহীত। জুলাই—ডিসেম্বর ১৮৩০, এর মধ্যে 'সমাচার দর্পণে' এই কয়টি সভার উল্লেখ পাইতেছি: 'বঙ্গহিত' (কলিকাতা হইতে দ্বাদশ ক্রোশ দূরে প্রতিষ্ঠিত), 'এংলো-ইণ্ডিয়ান হিন্দু এসোসিয়েশ্যন', 'জ্ঞান-সন্দীপনী সভা', 'ডিবেটিং ক্লাব', 'রঙ্গরঞ্জিনী সভা'—"সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ, ১২১-২৩

২ অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে বর্তমান লেখকের "শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬৬"-এ বিস্তৃততর আলোচনা দ্রষ্টব্য

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রাধান্য সময়ে শুধু ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনাই শুরু হয় নাই, বয়স্কেরা একাধিক সভা স্থাপন করেন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ আলোচনার নিমিত্ত। বাংলা ভাযা-সাহিত্যাদির অনুশীলন এবং বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয় রচনা বা আলোচনার জন্য কিছুকাল পরে হিন্দু কলেজ, অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, পটলডাঙা স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ তৎপর হইলেন। ১৮৩২ সনেই এইরূপ একটি সভার কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। ঐ সনের ৩০শে ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দুস্কুল-ভবনে সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা স্থাপিত হইযাছিল। এই সভা প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা উদ্যোগী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং হিন্দু কলেজের তৎকালীন শিক্ষার্থী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পরে, মহর্ষি) এবং রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমা-প্রসাদ রায় প্রধান ছিলেন। এটি পুরাপুরি ছাত্রদের সাহিত্য-সভা। প্রথম দিনের সভায় হিন্দু কলেজের ছাত্র রমাপ্রসাদ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

'গৌড়ীয় ভাযার উত্তমরূপে আলোচনার্থ' সভা স্থাপনের নিমিত্ত পূর্বেই একখানি অনুষ্ঠানপত্র রচিত ও ছাত্রদের মধ্যে প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানপত্রের ভিত্তিতে সভার কার্য আরম্ভ হইল। প্রথমেই জয়গোপাল বসু বলিলেন, 'এই মহানগরে বঙ্গভাষার আলোচনার্থ কোনো সমাজ সংস্থাপিত নাই অতএব উক্ত ভাযায় আলোচনার্থ আমরা এক সভা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ইহাতে আমারদিগের অনুমান হয় যে এই সভার প্রভাবে মঙ্গল হইবেক।' দেবেন্দ্রনাথ এই বলিয়া অভিনন্দন জানান যে, এই সভা চিরস্থায়ী হইলে উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে

পারিবে। সর্বসম্মতিক্রমে রমাপ্রসাদ রায় সভার সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ তখন মাত্র পঞ্চদশবর্ষীয় যুবক, কিন্তু তখনই তাঁহার কর্মশক্তির উপর ছাত্রমহলে বিশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল। উভয়ে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলে সভার কর্মসূচী স্থির হয়। প্রথমেই ইহার নিয়মাবলী ধার্য হইল। প্রতি সপ্তাহে রবিবার সভার অধিবেশন হইবে এইরূপ কথা থাকে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে 'ধর্ম'ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলা ভাষায়ই সভার প্রতিটি কার্য সমাধা হইবে— সভ্যগণ একবাক্যে এ কথায় সম্মতি প্রদান করেন।[১]

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার অন্য কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তখন নব্যশিক্ষিতেরাও যে বাংলা ভাষায় যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় অগ্রসর হইতেছিলেন, ইহা বড়ই শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ঐ সময়কার বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার গুরুত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' সভার উদ্দেশ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। এই সভাপ্রতিষ্ঠার সাত বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয়। শেষোক্ত সভার অঙ্কুর আমরা এই সভার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি।

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার ন্যায় 'বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা'ও যে বঙ্গভাষা-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে স্থাপিত হয়, নাম হইতেই তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এই সভা প্রতিষ্ঠার সঠিক সন তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই। তবে মনে হয় বড়লাট বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন ধার্য করিয়া গেলে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বঙ্গভাষার প্রকর্ষের নিমিত্ত এই সভা স্থাপন করিয়াছিলেন; সভার সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত গৌরী-

১ সভা-প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ ১৯শে জানুয়ারী ১৮৩৩ দিবসীয় 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছে। দ্র° "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ১২৪-৫।

শঙ্কর তর্কবাগীশ। তিনি পরবর্তীকালে ‘সম্বাদ ভাস্কর’ নামে বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদনা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। সভার সম্পাদক — পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন। তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভার সদস্য ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ‘সংবাদ প্রভাকর’-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ‘সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়’-সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, প্যারীমোহন বসু প্রমুখ সাহিত্যিক এবং বিদ্যোৎসাহীদের নাম সদস্যরূপে পাওয়া যাইতেছে। সভার অধিবেশন হইত প্রতি বৃহস্পতিবারে।

সভার একটি অধিবেশন হয় ১৮৩৬ সনের ৮ই ডিসেম্বর। সভাপতি হন যথারীতি ইহার স্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। এই সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল—‘দুঃখ হইতে সুখ জন্মে, কি সুখ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়’। গোড়াতেই বিষয়টির অবতারণায় রামলোচন ঘোষ আপত্তি করেন। কারণ এতাদৃশ বিষয়ের আলোচনার মধ্যে ধর্ম্মের সম্পর্কিত কথা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। অথচ ‘ধর্ম্ম’ আলোচনা নিয়মবহির্ভূত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সভার কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি নিয়ম নির্ধারিত ছিল। ঐ সময় কতকগুলি রাষ্ট্রীয় বিষয় সাধারণের মনকে আলোড়িত করিতেছিল। ইহার মধ্যে একটি— নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্তকরণ। রামলোচন ঘোষ অতঃপর এই মন্তব্য করেন, ‘নীতি এবং রাজকার্য্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক।’ কালীনাথ রায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব* আনয়ন করিলে

* "Baboo Kaleenath Roy next proposed, that the *Banga Bhasa Prakasika* do interpose when any of the acts of Government may be found injurious to the country, a resolution be taken that the society should petition Government or take other measures with a view to prevent a national grievance.—'সমাচারদর্পণ' (দ্বিভাষিক), ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৩৬।

তাহা সকলেই সংগত মনে করিলেন। সম্পাদক দুর্গাপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন নিয়মাবলী পুস্তকে এই প্রস্তাব সন্নিবেশিত করেন। ইহার পর সভা রাজনৈতিক কার্যেই আত্মনিয়োগ করিলেন। এ-বিষয়ক সভা-সমিতির মধ্যে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভাই প্রথম স্থান লাভ করে। সভার অন্যতম প্রধান সদস্য কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' পরে লিখিত হয়—

"রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা জন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্ত্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল ঐ সময়ে সম্বাদ ভাস্কর পত্রের জন্মগ্রহণও হয় নাই, কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে, রায় কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি মহাশয়েরা ব্রহ্মসভা পক্ষে থাকাতে ধর্ম্মসভার লোকেরা তাহাতে সংযুক্ত হয়েন নাই, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তরে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়,...।"*

একটি সাহিত্যমূলক সভা কিরূপে রাজনৈতিক সভায় পরিণত হইল তাহার পরিচয় আমরা এখানে পাইলাম। এখন যে সভাটির কথা বলিব, শেষে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইহারও আত্মবিলুপ্তি ঘটে।

এই সময়ে কলিকাতায় বঙ্গভাষার আলোচনার নিমিত্ত

* 'সংবাদ প্রভাকর', ২রা মার্চ ১৮৫২

'জ্ঞানচন্দ্রোদয়' নামে আর একটি সভা স্থাপিত হয় (সেপ্টেম্বর ১৮৩৬)। ইহার সভাপতি শ্যামাচরণ শর্মণঃ এবং সম্পাদক রাধানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সভার উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কতকগুলি নিয়মও রচিত হয়। দুই-তিন বৎসরের মধ্যে বঙ্গভাষা-সাহিত্যের আলোচনার জন্য কলিকাতায়, কলিকাতার উপকণ্ঠে এবং ক্রমশঃ ঢাকা শহরেও সভাদি গঠিত হয়। ১৮৩৮ সনের মাঝামাঝি কলিকাতায় বঙ্গরঞ্জিনী সভা, প্রবোধ উজ্জ্বল সভা, খিদিরপুরে শুভদা সভা এবং ঢাকায় তিমিরনাশক সভা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়।*

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা

কিন্তু কলিকাতার সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধনে রত হয় এবং একারণে প্রসিদ্ধিলাভও করে। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ তখন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সংঘবদ্ধ ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার উপকারিতা কখনও ভুলিতে পারেন নাই। বরং তৎকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা ভাবিয়া এরূপ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অধিকতর তৎপর হইলেন। তাঁহারাই ১৮৩৮ সনের প্রথম দিকে ব্যাপকতর উদ্দেশ্য লইয়া সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপনের উদ্যোগ করেন। সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং স্বদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনাও এই সভার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য হইল। তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে— এই পাঁচ জনের স্বাক্ষরে ২০শে

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ, ১২৩, ১২৮, ৬৫৯

জানুযারী ১৮৩৮ তারিখ সম্বলিত, উক্ত সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য প্রভৃতির ব্যাখ্যাসহ একখানি বিজ্ঞপ্তিপত্র* (Circular) নব্য-শিক্ষিত যুবসমাজের মধ্যে প্রচারিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিপত্রে বলা হইল— আমরা বিদ্যালয়ে যে-সব বিষয় শিক্ষা করি, কর্মজীবনে প্রবেশের পর চর্চার অভাবে প্রায়শঃ আমরা তাহা ভুলিয়া যাই, পঠিত বিষয়ের অতিরিক্ত জ্ঞান বর্ধিত ও প্রসারিত হওয়া তো দূরের কথা। অধিগত বিদ্যা সমাজের বিশেষ কোনো কাজে আসে না, ইহার উন্নতির সম্ভাবনাও থাকে না। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য বিদ্যা-চর্চা বৃদ্ধি এবং সমবেত প্রয়াসে প্রবৃত্তি এই দুইয়েরই কারণে একটি সভা গঠন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। প্রস্তাবিত সভার কার্য সম্বন্ধে এই পত্রে কিছু কিছু আভাস দেওয়া হয়। সভায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশোন্নতি সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ে সময় সময় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান চলিবে। লেখক বা বক্তা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণন দ্বারা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়তা করিবেন। আর শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তো স্বদেশের উন্নতি চান। উক্ত বিজ্ঞপ্তিপত্রে উল্লিখিত হয় যে, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রামকমল সেনের নিকট হইতে সভার অধিবেশন-স্থলরূপে কলেজ-হল ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে, এবং ১৮৩৮, ১২ই মার্চ দিবসে সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভা হইবে।

বিজ্ঞপ্তিপত্র যথারীতি প্রচারিত হইল। কলেজ-হলে ১২ মার্চ ১৮৩৮ তারিখে সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। তিন শতাধিক যুবক

* *Selections from discourses delivered at the Meetings of the Society for the Acquisition of General Knowledge,* Vol. I, 1840. বর্তমান লেখকের 'জাতিবৈর' পুস্তকের ৫০-৩ পৃষ্ঠায় (১৯৪৬) ইহা হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন। আলাপ-আলোচনার পর পূর্বোক্ত নামে * ও পূর্ব-প্রচারিত উদ্দেশ্যে সভা গঠিত হইল। সভাপতিপদে বৃত হইলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তিনি হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, রাজা রামমোহন রায়ের শিষ্য, যুবকদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং নব্যবঙ্গের নেতৃপদ গ্রহণে যোগ্যতম ব্যক্তি। সহকারী সভাপতি হন— কালাচাঁদ শেঠ এবং রামগোপাল ঘোষ; সম্পাদক— রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র; কোষাধ্যক্ষ— রাজকৃষ্ণ মিত্র। এতদ্ব্যতীত অধ্যক্ষ সভার সদস্য হইলেন ছয় জন— পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ দে। ডেভিড হেয়ার 'ভিজিটর' বা পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রবীণেরা সভায় যোগ দেন নাই। তবে তাঁহারা যে ইহার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। এই অধিবেশনেই সভার কার্য পরিচালনার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটির নিয়মাবলীর আদর্শে পনেরটি মাত্র নিয়ম ধার্য হয়। কয়েকটির মর্ম এই: সভ্যদের চাঁদা দেওয়া ইচ্ছাধীন; প্রতি মাসে দ্বিতীয় বুধবার সন্ধ্যায় সভার অধিবেশন হইবে; বাংলা, ইংরেজী উভয় ভাষাতেই লিখিত প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা প্রদান চলিবে; পরবর্তী অধিবেশনে যে বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা হইবে পূর্ব অধিবেশনে তাহা বিজ্ঞাপিত হওয়া আবশ্যক; প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দানের পর তৎসম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার কর্তৃপক্ষ নীরবে কার্য সম্পাদন করিতেন। প্রথম ও দ্বিতীয়

* ইহার ইংরেজী নাম—"Society for the Acquisition of General Knowledge".

অধিবেশনের পর, সভার অধিবেশনাদির সংবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ সংবাদ-পত্রে স্থান পায় নাই। এই সভা ১৮৪০, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে যথাক্রমে তিন খণ্ড পুস্তকে * সভার উদ্দেশ্যপত্র, নিয়মাবলী, পঠিত প্রবন্ধসমূহ এবং সদস্যদের তালিকা প্রকাশিত হয়। এই তিন খণ্ড পুস্তকের উপর নির্ভর করিয়া ইতিপূর্বেই সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার বিষয় পুস্তকে ও প্রবন্ধে (একটি প্রবন্ধে সংক্ষেপে) আলোচনা করিয়াছি। † এখানেও সভা সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই মাস পরে ১৬ই মে ১৮৩৮ তারিখে প্রথম সভার অধিবেশন হয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাণ (ইতিহাস) পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। সেদিন ঝড়বৃষ্টিজনিত দুর্যোগ সত্ত্বেও প্রায় এক শত সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই বক্তৃতার ভাবসমৃদ্ধ বিষয়বস্তু সম্পর্কে সভার সহকারী সভাপতি রামগোপাল ঘোষ বন্ধু ও অন্যতম সদস্য গোবিন্দচন্দ্র বসাককে একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। ‡

প্রথম অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে বাহির হয় বটে কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রচারবিমুখ হওয়ায় পরে ইহার অধিবেশনাদির সংবাদ পত্রিকাস্তম্ভে প্রচারিত হয় নাই, বলিয়াছি। উপরি-উক্ত তিন

---

* *Selections from Discourses, etc., etc.*, Vol. I (1840), Vol. II (1842), Vol, III (1843).

† "জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ" (১৩৫৩); "শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা" (১৩৫৮); "বঙ্গশ্রী"—আশ্বিন ১৩৫৯।

‡ "It was as remarkable for its chaste and elegant language as well for the varied information with which it was replete. The illustrations were apt and striking ; and were chiefly drawn from ancient history."—"Life of Ramgopal Ghose" in *A General Biography of Bengal Celebrities, etc.*, by Ram Gopal Sanyal p. 171, 1889.

খণ্ড পুস্তক হইতেই আমরা সভার আনুপূর্বিক বিবরণাদি পাইতেছি। প্রথম খণ্ড পুস্তকে স্থান পায় ১৮৩৮ সনে পঠিত পাঁচটি, ১৮৩৯ সনে পঠিত আটটি এবং ১৮৪০ সনে পঠিত একটি— একুনে চোদ্দটি প্রবন্ধ বা প্রস্তাব। প্রবন্ধ পঠিত হইবার তারিখও ইহার সঙ্গে প্রদত্ত হয়। এই চৌদ্দটি প্রবন্ধের মধ্যে পাঁচটি রচিত হয় মাতৃভাষা বাংলায়। ইহার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ছিল—'এদেশীয় লোকদিগের বাঙ্গলাভাষা— উত্তমরূপে শিক্ষা-করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষে। "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র তৎকালীন— সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্য ১৮৩৮, ১৩ই জুন তারিখে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা, যতদূর মনে হয়, বাংলা ভাষায় বাঙালী কর্তৃক সর্বপ্রথম এই প্রবন্ধেই আলোচিত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রস্তাব বা প্রবন্ধগুলি বিষয়বস্তুও ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। কাব্য, বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক বিবরণ এবং ইহার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিসংখ্যান, হিন্দুনারীর অবস্থা, ভারতবর্ষের সংক্ষেপ ইতিহাস (বাংলায় তিনটি অংশে লিখিত), চট্টগ্রামের বিবরণ, হিন্দু রাজাদের আমলে হিন্দুস্থানের অবস্থা, নব্যশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে নূতন নূতন সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কারের প্রবর্তন ইত্যাদি শীর্ষক ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ এই খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। উল্লিখিত প্রস্তাব বা প্রবন্ধগুলির শেযোক্তটি পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। চট্টগ্রামের উপরে লিখিত প্রবন্ধ গোবিন্দচন্দ্র বসাকের। প্যারীচাঁদ মিত্র রচনা করেন হিন্দু রাজাদের আমলে হিন্দুস্থানের অবস্থা নামক প্রবন্ধটি।

প্রতি খণ্ড পুস্তকের শেষে একটি করিয়া সভ্য-তালিকাও প্রদত্ত হয়। প্রথম খণ্ডের (১৮৩৮-১৮৪০ সনের প্রারম্ভ পর্যন্ত) শেষে প্রদত্ত

তালিকার সভ্য-সংখ্যা পাই ১৬৬ জন। পরবর্তী দুইটি তালিকায় সভ্য-সংখ্যা কিঞ্চিৎ রদবদল এবং বর্ধিত হইয়া দাঁড়ায় প্রায় দুই শত জনে। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে গণ্যমান্য প্রায় সকলেই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রথম তালিকার সভ্যদের মধ্যে এগার জন ছিলেন কলিকাতার বাহিরে। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— চন্দ্রশেখর দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক। কলিকাতায় স্থিত সভ্যদের মধ্যে ছিলেন— ভোলানাথ চন্দ্র, বেণীমাধব মিত্র, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি), গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (অরু ও তরু দত্তের পিতা), গুরুচরণ দত্ত, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কাশীশ্বর মিত্র, ক্ষেত্রচন্দ্র দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, নীলমণি মতিলাল, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সরকার, শিবচন্দ্র দেব, উদয়চন্দ্র আঢ্য প্রভৃতি। অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণের নামও সভ্য-তালিকায় স্থান পাইয়াছিল।

সভার দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় এপ্রিল ১৮৪০ হইতে মে ১৮৪১ পর্যন্ত পঠিত প্রবন্ধের অধিকাংশ। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠের সঙ্গে এই বৎসরে বিজ্ঞানের— শারীরতত্ত্ব, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা, প্রভৃতির আলোচনাও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ছোটনাগপুরের ভৌগোলিক বিবরণ, সিংহভূমের বিবরণ, চট্টগ্রামে তুলার চাষ, চট্টগ্রামের বিশদ বিবরণ, নব্যশিক্ষিতদের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা— প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পদার্থবিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ এবং সাতকড়ি দত্তের 'চক্ষুর গড়ন', প্রসন্নকুমার মিত্রের 'কর্ণের গড়ন' সম্বন্ধীয় বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রত্যেকেই ঐ সময় মেডিক্যাল কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। এবারের কতকগুলি প্রবন্ধ পরবর্তী খণ্ডের জন্য মজুত রাখা হয়।

এই দুই খণ্ড পুস্তক প্রকাশের পর ‘বেঙ্গল হরকরা’ ১৮৪৩, ১৬ই জুন তারিখে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা এবং উক্ত পুস্তক দুই খণ্ড সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া সাধারণ ভাবে কিছু লিখিয়াছিলেন। ‘হরকরা’ দুঃখ করিয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর নিয়মিত ভাবে সভায় কার্য চলিলেও, ইহার কথা সাধারণ্যে তেমন প্রচার নাই। প্রতিষ্ঠাবধি প্রতি মাসে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে, এবং তাহাতে সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-সমূহ পঠিত হয়। প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা-দান, তৎসম্বন্ধে আলোচনা, আর সভার পুস্তকে এই সমুদয় রচনার অধিকাংশ প্রকাশ— এসব বিষয়ও ‘হরকরা’ উল্লেখ করেন। ‘হরকরা’ আরও বলেন, বক্তা বা প্রবন্ধপাঠক নিজ নিজ বিষয় ধার্য করেন এবং ইংরেজী-বাংলা যে-কোন ভাষায়ই লিখিতে পারেন।*

সভার তৃতীয় খণ্ড পুস্তকে জুলাই ১৮৪১ হইতে এপ্রিল ১৮৪২ পর্যন্ত পঠিত প্রবন্ধসমূহের কয়েকটি এবং আগেকার উদ্বৃত্ত প্রবন্ধগুলি স্থান পাইয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্র বসাকের ত্রিপুরা জেলা ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিবরণসম্বলিত পাঁচটি প্রবন্ধ পর পর পঠিত হয়। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “Native Female Education” বা এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষা শীর্ষক একটি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধে (যাহা ১৮৪১ সনে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছিল) উল্লিখিত কতকগুলি বিষয়ের সমালোচনা করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪২ সনের ১২ই জানুয়ারীর সভায়। প্রসন্নকুমার মিত্র এই সময় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যয়ন শেষ করিয়া সেখানেই কর্মে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি পাঠ করেন “On the Physiology of

* লেখকের ১৯৪১ সনে প্রকাশিত "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পুস্তকে (পৃ ১৪৮) ১৬ই জানুয়ারী ১৮৪৩ সনের বেঙ্গল হরকরায় "Society for the Acquisition of General Knwoledge" শীর্ষক প্রস্তাবটি পুরাপুরি উদ্ধৃত হইয়াছে।

Digestion" নামীয় পরিপাকক্রিয়ার শারীরতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। ইহার পর সভা হইতে আর কোন প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় অতঃপর রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদিও পঠিত হইতে সুরু হয়। সভার অধ্যক্ষগণ ১৮৪২ এপ্রিল হইতে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে সভার একখানি মুখপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই আলোচনা হইত। সভার অধ্যক্ষগণ সমসাময়িক রাজনীতিকেও আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়া ইহার উদ্দেশ্য ব্যাপকতর করিয়া লইলেন। তখন রাষ্ট্রকর্তৃক অবলম্বিত নীতি ও বিধি প্রতিকূল সমালোচনা হইতে থাকে। ভূম্যধিকারী সভা একটি বিশেষ ব্যবস্থাগুলির বিধির প্রতিরোধকল্পে স্থাপিত (১৮৩৮) হইলেও কর্তৃপক্ষ সাধারণের হিতকর বিষয়ের আলোচনায় রত ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতহিতৈষী বাগ্মীশ্রেষ্ঠ জর্জ টমসনকে ভারতবর্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য নিজ ব্যয়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। জর্জ টমসন ছিলেন ক্রীতদাস-প্রথার ঘোরতর বিরোধী এবং ভারতবাসীদের দুর্দশায় বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন। বিলাতে রামমোহন বন্ধু উইলিয়ম অ্যাডামের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ১৮৩৮-৩৯ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একজন প্রধান সদস্য ছিলেন তিনি। দ্বারকানাথ ভারতহিতৈষী টমসনকে নব্য শিক্ষিত যুবকগণ— তখন এককথায় আখ্যাত নব্যবঙ্গ বা 'ইয়ং বেঙ্গলে'র সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা নব্যবঙ্গের পক্ষে ১৮৪৩, ১১ই জানুয়ারী জর্জ টমসনকে একটি প্রকাশ্য অধিবেশনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নব্যবঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ

টমসনের সঙ্গে স্বদেশের সামগ্রিক উন্নতির নিমিত্ত আলাপ-আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা ২০নং ফৌজদারী বালাখানাস্থিত ভবনে (বর্তমান কলুটোলা স্ট্রীট ও লোয়ার চিৎপুর রোডের মোড়) টমসনের থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইতিমধ্যে সংস্কৃত কলেজ ভবনে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার এক অধিবেশনে, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩ তারিখে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন রিচার্ডসনের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়বস্তু লইয়া বিতণ্ডার অবতারণা হয়। সভার কর্তৃপক্ষ ইহার উক্ত ফৌজদারী বালাখানায়ই সভার অধিবেশনস্থল নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই, ২০শে এপ্রিল (১৮৪৩), সভার অধ্যক্ষগণ টমসনের পরামর্শে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিষয়াদি রীতিমত আলোচনার নিমিত্ত বিলাতস্থ সভার আদর্শে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করিলেন। সভার মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'— প্রথমে মাসিক, পরে পাক্ষিক ও শেষে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এইভাবে নূতন সভার মধ্যে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা নব রূপ লাভ করিল।

তত্ত্ববোধিনী সভা

সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা স্থাপনের কিঞ্চিদধিক দেড় বৎসর পরে তত্ত্ববোধিনী সভার আবির্ভাব। ১৭৬১ শকের ৬ই আশ্বিন, ১৮৩৯ খৃস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দশ জন যুবক রাজা রামমোহন রায়ের সহকর্মী পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একযোগে এই সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা', দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে ইহার নাম হইল তত্ত্ববোধিনী সভা। গৌড়ীয় সমাজ হইতে এ পর্যন্ত বহু সভা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু জাতীয়তার ব্যাপক ও উদার আদর্শ লইয়া

এই সভাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইল। গৌড়ীয় সমাজ, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা (প্রথমপর্ব) প্রভৃতির মধ্যে যাহার বীজ উপ্ত ছিল, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন এবং অনুরূপ ছাত্র ও যুব-সভাগুলির ভিতরে আমরা যে সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহার যেন গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম হইল এই তত্ত্ববোধিনী সভায়। এখানেও নব্যশিক্ষিতেরাই ভিড় জমাইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহাদের ভাবাদর্শ কাল ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিশ্রুত হইয়া একটি স্পষ্ট জাতীয় আকার পরিগ্রহের সুযোগ লাভ করে। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার কথা বলিয়া, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন :

"কিন্তু আর একটি সভাও ঐ সময়ে সংস্থাপিত হয়। ইহা উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার ফল অধিকতর কালব্যাপী হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্ব্বতোভাবে রাজকায় কার্য্যবিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্মপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল সমস্ত তেমনি দূরতর পরবর্ত্তিগণের ভোগ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে নদী উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হয়, তাহার প্রবাহও তেমনি দূরগামী হইয়া থাকে।"*

বস্তুতঃ তত্ত্ববোধিনী সভা অন্যান্য সভা অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৫৯ সনের মে মাসে প্রায় কুড়ি বৎসর জীবিত থাকিয়া ইহা উঠিয়া যায়। কিন্তু সভার কার্য সমাজ-জীবনের নব রূপায়ণে যেমন সহায়তা করে এমনটি ইতিপূর্বে অন্য কোন একক প্রতিষ্ঠান দ্বারা

* বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ২৫

সম্ভবপর হয় নাই। জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা, বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার এবং সর্বোপরি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশে ভারতীয় সমাজের অভূতপূর্ব এবং আশ্চর্যজনক উপকার সাধিত হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য সভার নিয়মপত্রে প্রথমেই এইরূপ উক্ত হইয়াছে: "বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলিয়াছেন: "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।"* ইহাই আর একটু বিশদ করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে: "পরব্রহ্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সকলের মনে গাঢ়রূপে নিবেশ করিবার নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক গ্রন্থ সকল প্রকাশ করা, সমুদয় বেদ সংগ্রহপূর্বক তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপন এদেশে পুনঃস্থাপন করা এবং পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্র সকল কালে কালে কি তাৎপর্যে প্রণীত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান ও জ্ঞাপন করা এ সভার বিশেষ প্রয়োজন।"†

এই সকল উক্তি হইতে স্বতঃই মনে হইবে, তত্ত্ববোধিনী সভা একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান; কিন্তু ভূদেববাবু যেমন বলিয়াছেন, ইহা কোন বিশেষ শ্রেণী বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান রূপে আবির্ভূত হয় নাই; ইহার ভিত্তি উদার সর্বজনীন হিন্দুধর্মের সারতত্ত্বের উপর, আর ইহা কার্যে রূপায়ণের পন্থাগুলি জাতির সর্বপ্রকারে কল্যাণকর হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভার কার্যক্রমও প্রসারিত হয়। প্রথমে তত্ত্ব-বোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠার দ্বারাই সভার কার্য আরম্ভ হইল। বাংলা ও সংস্কৃত এবং পরে ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল একেবারে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। উচ্চাঙ্গের হিন্দু ধর্মের কথাও এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। পাঠশালার নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক রচিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৫

† ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক আয়ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তক, ভূমিকা ৵০

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিলেন। বর্ণমালা, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকাদিও লিখিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথমাবধি ইহার শিক্ষক ছিলেন, এবং উক্ত পুস্তকসমূহ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৪০ সনের মধ্যভাগে এই পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে, ১৮৪৩, সনের ৩০শে এপ্রিল সভার কর্তৃপক্ষ পাঠশালাটিকে বংশবাটী বা বাঁশবেড়েতে স্থানান্তরিত করেন। বংশবাটীতে পাঠশালাটির বিশেষ উন্নতি হয়। ১৭৬৭ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণে প্রকাশ: "এইক্ষণে ১২৭ জন ছাত্র ছয় শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বঙ্গ এবং ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যয়ন করিতেছে…।" উক্ত বিবরণে পুনরায় পাই: "এই পাঠশালাতে পদার্থবিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বঙ্গভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্রসকল প্রচারিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক," ইত্যাদি।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার আদর্শে মফস্বলেও পাঠশালা বা স্কুল স্থাপিত হইল। মূল পাঠশালাটি ১৮৪৮ সনের প্রথমে অর্থাভাব হেতু উঠিয়া যায়। তত্ত্ববোধিনী সভা এই বিদ্যালয়ের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষার আদর্শ রূপদান করিতে প্রয়াস পান। পরবর্তী কালে জাতীয় শিক্ষাকল্পে জাতীয় বিদ্যালয়াদি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাই ঐ সকলের আদি এবং একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শে পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

ক্রমে সভার কার্যক্রম প্রসারিত হইল। ইহার দ্বিতীয় কার্য বেদাধ্যয়নে সহায়তা, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ও পর্যালোচনা। ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণে প্রকাশ: "এতদ্দেশে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনের চালনার নিমিত্তে ঐ ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা

একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া চারি জন ছাত্রকে উপনিষৎ অধ্যাপন করিতে লাগিলেন…।" কিন্তু সভা-কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই অনুভব করিলেন যে, বঙ্গদেশে মূল বেদ দুষ্প্রাপ্য এবং বেদের পঠন-পাঠন লুপ্তপ্রায়। একারণ "দূরদেশ হইতে তাহা সংকলন করিতে সভা বাধ্য হইলেন।" তাঁহারা প্রথমে আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য (পরে, বেদান্তবাগীশ) নামে একজন যুব-ছাত্রকে কাশীধামে ১৭৬৬ শকে পাঠাইলেন। তিনি "তথায় বেদান্তদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ও মুল বেদ সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রতিলিপি বা ক্রয়দ্বারা সংগ্রহপূর্ব্বক শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন।" কিন্তু একজনের পক্ষে চারি বেদ অধ্যয়ন বিস্তর সময়সাপেক্ষ, এহেতু ইহার এক বৎসর পরে সভা ধার্য করিলেন যে, চারি বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত চারিজন ছাত্রের উপর ভার দিতে হইবে। ১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণে প্রকাশ: "ইহাতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা আর তিন জন ছাত্র ১৭৬৭ শকে [১৮৪৫] কাশীধামে গমন করিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। তদবধি চারি জন ছাত্রের চারি প্রকার বেদ ও তাহার ভাষ্য অর্থ সহিত অধ্যয়ন হইতেছে।"

সভা ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ নাগাদ ছাত্রগণকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনেন। ইঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য (বেদান্তবাগীশ) সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহাদের আহৃত জ্ঞান এবং সংগৃহীত মুল শাস্ত্র-গ্রন্থের পুথি দ্বারা সভা বিশেষ উপকৃত হয়। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ১৮৪৮, আগস্ট মাস হইতে ঋগ্বেদের মূল পুথির উপর নির্ভর করিয়া উহার সূক্তের মুলসহ অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সভা দ্বারা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর চূর্ণক, বিভিন্ন উপনিষদের বাংলা এবং ইংরেজী অনুবাদ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও পরে তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া স্বল্পমূল্যে

প্রচারিত ইহতে লাগিল। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইল সেই কথাই এখন বলিব।

আর ইহাই সভার তৃতীয় কার্যক্রম। ১৭৬৫ শকে [১৮৪৩] তত্ত্ববোধিনী সভা একটি মুদ্রাযন্ত্র লাভ করিলেন। উপরি-উক্ত সাম্বৎসরিক বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে: "যদিও জ্ঞানপ্রচার করা তত্ত্ববোধিনী সভার মুখ্য কার্য্য হইল, তথাপি প্রথমত কিছুদিন আয়ের অল্পতা প্রযুক্ত তদ্বিষয়ে সভা ক্ষুব্ধ ছিলেন। কোন দেশহিতৈষি মহাত্মা ১৭৬৫ শকে সমুদয় অক্ষরের সহিত এক মুদ্রাযন্ত্র এ সভায় দান করিলেন তদবধি এই সভার উন্নতির সূত্র হইল। নিয়মিত রূপে প্রতিমাসে এক পত্রিকা প্রকাশ করায় তত্ত্ববোধিনী সভা সপ্রতিজ্ঞ হইলেন।" এই মুদ্রাযন্ত্র দান করেন রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং তত্ত্ববোধিনী সভার ঐ সময়কার সভাপতি রমাপ্রসাদ রায়। সভার মুখপত্র স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য উক্ত বিবরণে এইরূপ লিখিত হয়: "শ্রুতিসিদ্ধ পরব্রহ্মের লক্ষণ এবং সংস্কৃতি বৃত্তি ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত উপনিষৎ ও যথাসাধ্য যুক্তিদ্বারা তাহা সংস্থাপন এবং পরমেশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা ও প্রচার, মুক্তির ক্রম ও লক্ষণ, নীতি ও ধর্মের অনুষ্ঠান, কার্য দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি জ্ঞাপন এবং ঈশ্বরের কার্য দর্শাইয়া তাঁহার শক্তির আলোচনার নিয়ম জন্য শারীরিক ও মানসিক বিষয়ক বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা এবং ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার সহিত প্রকাশিতব্য স্থির করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৫ শকের ভাদ্র (১৮৪৩, আগস্ট) মাস হইতে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় বাহির হইতে আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমারের পদের নাম হইল 'গ্রন্থসম্পাদক'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিলেন তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যমণি। তিনি আত্মজীবনীতে সভাপ্রতিষ্ঠা, সভা কর্তৃক পত্রিকাপ্রকাশ প্রভৃতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। সভা দ্বারা প্রকাশিতব্য পুস্তক এবং পত্রিকায় প্রকাশিতব্য প্রবন্ধাদি পরীক্ষণের জন্য দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে একটি 'পেপার-কমিটি' বা গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা পাঁচ জন সভ্য লইয়া গঠিত হইল। গ্রন্থ-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত অতিরিক্ত সদস্য হইলেন। অধিকাংশের মতে যাহা প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইত তাহাই পত্রিকায় স্থান পাইত এবং কোন কোন বিষয় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইত। ১৭৬৮ শক হইতে ১৭৭৪ শক পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক বিবরণের মধ্যে গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভার এই সকল গুণী, জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পাইতেছি: রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাশীনাথ দত্ত, চন্দ্রশেখর দেব ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। গ্রন্থাধ্যক্ষগণের এবং গ্রন্থ-সম্পাদকের কার্যের সপ্রশংস উল্লেখ করা হইয়াছে সাম্বৎসরিক বিবরণগুলিতে।

পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রথমে ছিল মাত্র আট। ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়া ১৭৭০ শক (১৮৪৮ খৃঃ) অবধি চব্বিশ পৃষ্ঠায় দাঁড়ায়। উক্ত শকের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: "এ সভার কার্য্য সাধনের মূল যন্ত্র যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, গত বৎসরে তাহার বিশিষ্টরূপে উন্নতি হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতা, মহাভারতের অনুবাদ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, এবং উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ, এই চতুর্ব্বিষয় নিয়মিতরূপে প্রকাশ হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন পরমেশ্বরের কৌশল বর্ণনাদি অপরাপর বিবিধ প্রস্তাব সর্ব্বদাই লিখিত হয়।" মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ঋগ্বেদ সংহিতার এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদকার্যে লিপ্ত হন। গ্রন্থ-সম্পাদক অক্ষয়কুমার অন্য দুইটি

প্রস্তাবের লেখক। রাজনারায়ণ বসু এবং শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মসম্পৃক্ত বিষয়াদির রচয়িতা। অতঃপর উক্ত বিবরণে পাই "কেবল গ্রন্থাধ্যক্ষদের যত্নে ও উৎসাহে নানা প্রকার হিতকর বিষয় সভার পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতেছে, অতএব তাঁহাদিগকে শতশত ধন্যবাদ করি।" গ্রন্থ-সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের "উৎসাহ ও যত্ন" এবং "পরিশ্রমের"ও ধন্যবাদ করা হয়। ক্রমে পত্রিকায় মানুষের জ্ঞানধর্ম্ম এবং অন্যান্য বিষয়ও প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সব বিষয়ের কোন কোনটি সচিত্র হইয়া বাহির হয়। সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব, শিক্ষা, জীবনী, সমাজনীতি, শাস্ত্রানুবাদ, অর্থনীতি এবং কখনও কখনও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনাও পত্রিকায় স্থান পাইত।

এক হিসাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে সে-যুগের চিন্তানায়ক বলা চলে। লোকহিতকর বহুবিধ আন্দোলনের মূল নিহিত রহিয়াছে ইহার আলোচনার মধ্যে। শিক্ষায় স্বাবলম্বন, খৃস্টানদের আক্রমণ হইতে স্বধর্ম ও স্বধর্মীয়দের রক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা, সুরাপান-নিবারণ, শারীরিক শক্তির উন্মেষ, নীলকরের অত্যাচার, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয়, জমিদারি ব্যবস্থার কুফল, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বঙ্গবাসীদের প্রেরণা দেয়। বাংলার বাহিরেও কোন কোন প্রাদেশিক ভাষায় পত্রিকাখানির অনুরূপ সংস্করণ স্থানীয় লোকেদের উৎসাহে প্রকাশিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়া যাইবার পরেও দীর্ঘকাল যাবৎ এই পত্রিকাখানি জাতির ও সমাজের হিত সাধনে ব্রতী ছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভার মত এমন একটি সুদূরপ্রসারী এবং সুফলপ্রসূ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-প্রণালী সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। সভা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর দশ জন মাত্র যুবক লইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বলিয়াছি। কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য ও

আদর্শ সত্বর জ্ঞানী গুণী নব্যশিক্ষিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ১৭৬২ শক (১৮৪০) হইতে চারি বৎসরে ইহার সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৫, ১১৫, ৮৩ ও ১৩৮ জন। ১৭৬৮ শক (১৮৪৬) হইতে ১৭৭৫ শকের (১৮৫৩) মধ্যে এই সভ্য-সংখ্যা ৬০০ হইতে ৮০০ জন হইয়াছিল। জাতীয় ভাষা ও জাতীয় ধর্মপ্রণালী এখানে অনুসৃত হওয়ায় সে-যুগের প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারের যুবকেরাও আসিয়া ইহার সঙ্গে যোগ দেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজা রাধাকান্ত দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব জামাতা শ্রীনাথ ঘোষ ও অমৃতলাল মিত্র, এবং দৌহিত্র হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ, গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার কার্য সম্পাদনে সহায়তা করেন। সে-যুগের গণ্যমান্য নব্যশিক্ষিত, এমন কি সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও ইহার সঙ্গে আন্তরিক ভাবে যোগ দিয়াছিলেন। সভার নিয়ম পত্র সময়ে সময়ে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইলেও মূলতঃ ইহার উদ্দেশ্য প্রায় ঠিক থাকে। অধ্যক্ষ-সভা, কর্মাধ্যক্ষ, সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা প্রভৃতি মিলিয়া সভার কার্য নির্বাহ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহাতিশয়ে তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৪৩ সনে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। নির্জীব সমাজ আবার জীবন্ত ও প্রবল হইয়া উঠিল। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচেষ্টাসমূহ, বিশেষতঃ ধর্মপ্রচার-কার্য খৃস্টান পাদ্রীদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত করে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা রিভিয়ু পত্রিকায় কার্যবিবরণের সমালোচনা-চ্ছলে ইহার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করিয়াছিলেন। খৃস্টানগণও ধর্ম-বিষয়ক বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা প্রচারে অগ্রসর হইলেন। ১৮৪৫-৪৬ খৃস্টাব্দে একদিকে হিন্দু সমাজ এবং অন্যদিকে খৃস্টান পাদ্রীদের মধ্যে যে প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাতে হিন্দু সমাজের পক্ষে তত্ত্ববোধিনী সভা নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহাদের মুখপত্র

স্বরূপ জাতির মনে নব আশা এবং নূতন শক্তির সঞ্চার করিতে সক্ষম হন। হিন্দু 'হিতার্থী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠায় এই সভা ও পত্রিকা, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য জাতি বহুকাল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিবে। প্রাচীন ও নবীন হিন্দুগণ মিলিত হইয়া কার্যে অগ্রসর হইলে মিশনরীদের অপপ্রয়াসে বিষম বাধা পড়িল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভার কথা পূর্বে বলিয়াছি। মূল সভার কার্য নির্বাহার্থ প্রথমে সাত জন অধ্যক্ষ লইয়া সভা গঠিত হইত। দুই জন কর্মাধ্যক্ষ, একজন উপাধ্যক্ষ এবং একজন সম্পাদক থাকিতেন। ১৭৭৬ শকে (১৮৫৪) নিয়মাবলী সংশোধিত হয়। এই সময় তের জন অধ্যক্ষ লইয়া সভা গঠিত হইল। সম্পাদক দেখিতেছি একজন এবং সহকারী সম্পাদক দুই জন। বৈশাখ ১৭৬৫ শক (১৮৪৩) হইতে ১৭৮১, বৈশাখ (১৮৫৯) মাসে সভা রহিত হওয়া পর্যন্ত ইহার সম্পাদকপদে নিম্ন ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত দেখিতেছি: ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈশাখ ১৭৬৬—ফাল্গুন ১৭৬৭; নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈত্র ১৭৬৭—বৈশাখ ১৭৭৫; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৫—আষাঢ় ১৭৭৭; রমাপ্রসাদ রায়, অমৃতলাল মিত্র শ্রাবণ ১৭৭৭—১৭৭৯; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বৈশাখ ১৭৮০—বৈশাখ ১৭৮১ শক। অধ্যক্ষ-সভায়ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অধিষ্ঠিত ছিলেন, যথা: রমাপ্রসাদ রায়, চন্দ্রশেখর দেব, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, শ্রীনাথ ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, জয়গোপাল সেন, সত্যশরণ ঘোষাল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনন্দকৃষ্ণ বসু, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। কর্মাধ্যক্ষরূপে প্রথমে রাধাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং পরে একমাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে পাই। নিয়ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৭৭৬ শক হইতে সহকারী সম্পাদক দুইজন নিযুক্ত হন— অক্ষয়কুমার দত্ত এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-

বাগীশ। ১৭৭৮ শক হইতে প্রথমে একজন মাত্র সরকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইতে থাকেন; আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশই এই প্রথম সহকারী সম্পাদক।

১৭৭৬ শক হইতে নিয়ম পরিবর্তনের কতকগুলি কারণও ঘটিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভাকে একান্তভাবে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কার্যে নিয়োজিত করিতে চাহিলেন। তাঁহার ধর্মমতের বিবর্তন, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রভৃতিই ইহা সূচিত করে। রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্মমূলক একটি প্রবন্ধ লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ১৭৭৫ শকে গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার প্রতি বিরূপ হন। ২৬শে ফাল্গুন ১৭৭৫ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে ইহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়।* অনান্য বিষয়েএও অধ্যক্ষ-সভার সঙ্গে তাঁহার বিরোধ ঘটে। দেবেন্দ্রনাথ ইহার পর হিমালয় ভ্রমণে বহির্গত হন। দুই বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। এই সময় যুবক কেশবচন্দ্র সেনকে তিনি প্রধান সহকর্মী রূপে প্রাপ্ত হইলেন। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আহ্বানে ১৮৫৯, মে মাসে (২৬ শে বৈশাখ ১৭৮১ শক) অনুষ্ঠিত শেষ অধিবেশনে তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত করার প্রস্তাব গৃহীত হইল। একটি শক্তিশালী সভার এইরূপে জীবনাবসান ঘটে।

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুকে পত্রিকায় তাঁহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ সম্পর্কে ২৬ শে ফাল্গুন ১৭৭৫ শকে লেখেন :

"আশ্চয্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষরা ইহা তত্ত্ববোধিনী সভার প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলি নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে উক্ত বক্তৃতা আশু বা বিলম্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অবশ্য প্রকাশিত হইবেক।"—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী পৃ ১১

পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি, সর্বশুভকরী সভা

তত্ত্ববোধিনী সভা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকের রাজনৈতিক সভাসমিতিগুলিও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদির আলোচনায় অবকাশ ও বল পাইল। তত্ত্ববোধিনী সভা চতুর্থ দশকে ভারতবর্ষীয় সভার ('বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি') পরিপুরকরূপে কার্য করেন। পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার কর্মাধ্যক্ষ দেবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সম্পাদকরূপে ইহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে সবিশেষ উদ্যোগী হন। সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক বহু প্রতিষ্ঠান এই দুই দশকে স্থাপিত হওয়ায় জাতীয় কল্যাণসাধন সম্ভবপর হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে এ সমুদয় যে প্রেরণা লাভ করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ঐহেতু এই দুই দশককে আমরা 'তত্ত্ববোধিনী-যুগ' বলিয়া আখ্যাত করিতে পারি।

বড়বাজারের কয়েকজন নব্যশিক্ষিত যুবক মিলিয়া ১৮৪৭ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর 'পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি' গঠন করেন। সাহিত্য চর্চার ভিতর দিয়া আত্মোন্নতি এবং সমাজের হিতসাধন এই সভার উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হয়। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং কবিবর মধুসূদন দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুবিখ্যাত গৌরদাস বসাক এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। বড়বাজারস্থ বৈষ্ণবচরণ বসাকের গৃহে প্রতি সোমবারে সভার অধিবেশন হইত। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে সভ্যগণ এখানে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা করিতেন। সভার অধিবেশন নিয়মিতভাবে হইতেছিল। বড়বাজার অঞ্চলের নব্যশিক্ষিত যুবকগণ সাগ্রহে এ সময়কার শিক্ষা-সাহিত্যমূলক আলোচনায় যোগদান করিতেন।

সোসাইটির ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইহার ষষ্ঠ বার্ষিক

অধিবেশন হয় ১৮৫৩, ৩১শে ডিসেম্বর তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম অধ্যক্ষ বড়বাজারনিবাসী জয়গোপাল সেনের ভবনে। বাৎসরিক (১৮৫৩) কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, সভার আদর্শ অনুযায়ী সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চলিয়াছিল। বিজ্ঞান আলোচনার সুবিধা হয় আর একটি কারণে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সিনিয়র ছাত্রগণ এই সভায় তখন যোগ দেন। বার্ষিক বিবরণে বলা হয় যে, তাঁহারা বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা দ্বারা সভার কার্যে যেমন একদিকে সহায়তা করিয়াছেন, অন্যদিকে তখনকার সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা দ্বারাও তাঁহারা কম উপকৃত হন নাই। কেবলমাত্র বিজ্ঞানচর্চা করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বার্ষিক অধিবেশনে নৃসিংহদাস আঢ্য "Retrospect of the Year 1853" (১৮৫৩ সনের সালতামামি) শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই অধিবেশনে পর বৎসরের জন্য যে অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয়; তাহাতে দেখি, গৌরদাস বসাক সভাপতি, রাধাগোবিন্দ বসাক সহ-সভাপতি এবং নীলমণি বসাক সম্পাদক পদে বৃত হইয়াছেন।

সভাপতি গৌরদাস বসাক একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়া সভার কার্য পরিসমাপ্ত করেন। সভার সদস্যগণের জ্ঞানবর্ধন-স্পৃহা এবং সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিতরণকল্পে প্রয়াস দেখিয়া সবিশেষ আনন্দিত হন। তিনি বলেন যে, সভা বেথুন সোসাইটির কয়েক বৎসর পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার আদর্শে এখানকার প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনাদি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন যে, সভ্যগণ শুধু জ্ঞান আহরণে সন্তুষ্ট না থাকিয়া অধিগত বিদ্যা যাহাতে অধিকতর কার্যকরী ভাবে সমাজের সেবায় নিয়োজিত হয় সে বিষয়ে তিনি সভ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন।* এই হিতকর সভার মত যে তখন কত সভা-সমিতির উদ্ভব হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

* ষষ্ঠ অধিবেশনের বিবরণের মর্ম "The Hindu Intelligencer," January 9, 1854 হইতে গৃহীত।

শিক্ষিত যুবজনের আর একটি উল্লেখযোগ্য সভা— সর্বশুভকরী সভা। ১২৫৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে (১৮৫০, ফেব্রুয়ারী-মার্চ) হিন্দু কলেজের সিনিয়র বিভাগের কতিপয় ছাত্র কলিকাতা ঠনঠনিয়ার রামচন্দ্র চন্দ্রের ভবনে এই সভা স্থাপন করেন। সর্বপ্রকার কল্যাণকর প্রচেষ্টাই যে এই সভার উদ্দেশ্য তাহা ইহার নাম হইতেই বুঝা যাইতেছে। সভ্যগণ সভার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"আমরা কএকজন বন্ধু একমতাবলম্বী হইয়া অত্র ফাল্গুন মাসে সর্ব্বশুভকরী নামে এক সভা স্থাপন করিয়াছি। সভা সংস্থাপনের মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে কতকগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্দ্বারা এদেশের বিষম অনিষ্ট ঘটিতেছে ও কালক্রমে সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত কুরীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত্ত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্ন করা যাইবেক। কিন্তু এই সঙ্কল্পিত অসাধ্যসাধন বিষয়ে সর্বশুভকরী কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেক তাহা জগদীশ্বর জানেন।"

সভা এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত একটি অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। ইহা হইল 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ। ১২৫৭ সালের ভাদ্র মাস (আগস্ট ১৮৫০) হইতে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সুপরামর্শে এখানি সভার সভ্যগণ প্রকাশ করিলেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে সভার উক্ত উদ্দেশ্য আমরা জানিতে পারিয়াছি। ইহাতে আরও প্রকাশ :

"কি প্রাচীন কি নব্য উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরি স্বীকার করা উচিত যে কৌলীন্যব্যবস্থা, বিধবাবিবাহ প্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি যে কতিপয় অতিবিষম অশেষ রকমের কুৎসিত নিয়ম প্রচলিত আছে তৎসমুদায় নিরাকৃত হইলে এতদ্দেশের অনেক দুরবস্থা মোচন ও

মঙ্গল লাভ হইতে পারে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ দ্বারা কত প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে ইহা প্রায় সকল লোকেরি হৃদয়ঙ্গম আছে।"

সভা নিজ পত্রিকার মাধ্যমে এই সকল ত্রুটি ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত করিতে এবং তাহা নিবারণের উপায় নির্দেশে সচেষ্ট হইলেন। সমাজ-সংস্কারে সাহিত্য-পত্রিকাকে বাহন করার প্রয়াস মনে হয় এই প্রথম। পরে এই উদ্দেশ্যে কোন কোন সভা বা বিশিষ্ট ব্যক্তি পত্রিকাদি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বাল্য-বিবাহের দোষ কি' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাহির হয়। দ্বিতীয় সংখ্যায় 'স্ত্রীশিক্ষা' শীর্ষে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার।*

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ

সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙালী সমাজের নর-নারীর জ্ঞানবর্ধন ও চিত্তোৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া বঙ্গভাষানুবাদক, বা সংক্ষেপে, অনুবাদক সমাজ,† স্থাপিত হয় ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে। ইহার প্রায় ছয় মাস পূর্ব হইতেই এরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। আর এ বিষয়ে প্রথমে উদ্যোগী হইয়াছিলেন উত্তরপাড়ার জনহিতব্রতী জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শের একটি স্বল্পমূল্যে জ্ঞানগর্ভ মাসিক পত্রিকা প্রকাশের তখন কথা হইল। ক্রমে উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ একটি স্পষ্ট রূপ পায় বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের মধ্যে। ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখের

---

* বিদ্যাসাগব জীবনচরিত—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

† ইংরেজী নাম—Vernacular Translation Society; এই নামের ব্যতিক্রমও দেখি, যথা—'Vernacular Literature Committee' or Literature Vernacular Society.

'সত্যপ্রদীপে' এই সমাজ সংস্থাপনের কথা সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানপত্রখানিসহ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ২৮শে ডিসেম্বর সংখ্যায় সমাজের অনুষ্ঠানপত্রে সবিস্তারে বাহির হইল। অনুষ্ঠানপত্র* হইতে এই সমাজের উদ্দেশ্য, কমিটির প্রাথমিক সদস্য, অনুবাদের জন্য নির্ধারিত পুস্তকসমূহ, আদায়ীকৃত চাঁদার হিসাব সহ চাঁদাদাতাদের নাম প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা জানা যায়। অনুষ্ঠানপত্রে সমাজের উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

"ট্রাক্ট সোসাইটি কিম্বা খৃষ্টান নলেজ সোসাইটি কি স্কুল-বুক সোসাইটি কিম্বা আসিয়াটিক সোসাইটি চতুষ্টয় সভার সাহেবেরা সভার নিয়মমতে সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য উত্তম২ যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন না তাহা উক্ত কমিটির সাহেবেরা প্রকাশ করিবেন।"

প্রাথমিক কমিটি বা অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয় চৌদ্দ জন সদস্য লইয়া। ইহাদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন মাত্র তিন জন : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রসময় দত্ত। অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রথম নাম পাই ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের। বেথুন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ; কিন্তু বাঙালীগণ বিশেষতঃ নব্যশিক্ষিত বঙ্গসন্তানেরা মাতৃভাষার অনুশীলনে যাহাতে তৎপর হন সে বিষয়েও তিনি বড় উদ্যোগী ছিলেন। কাজেই সমাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই আশ্চর্য নহে। সভাপতি বলিয়া উল্লেখ না থাকিলেও মনে হয়, তিনি অধ্যক্ষ-সভায় পৌরোহিত্য করিতেন। সমাজের সম্পাদক ছিলেন হজসন প্রাট ও মেরিডিথ টাউনশেণ্ড। অন্য সদস্যদের মধ্যে পাদ্রী উইলিয়ম কে, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ডব্‌লিউ. ডব্‌লিউ সিটন-

* প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৬১ : "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ" প্রবন্ধে লেখক কর্তৃক সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত মাসিকের এই প্রবন্ধে এবং চৈত্র ১৩৬১ ও বৈশাখ ১৩৬২ সংখ্যায় তিনি এই সমাজের আনুপূর্বিক ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন।

কার, হেনরি উড্রোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যতর সম্পাদক হজসন প্রাট জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব প্রথম হইতেই সমর্থন করেন। সমাজ-প্রতিষ্ঠায়ও তাঁহার কৃতিত্ব রহিয়াছে যথেষ্ট।

অনুষ্ঠানপত্রে এই ইংরেজী পুস্তকগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের প্রস্তাব হয়: "রবিন্সন ক্রুসো। বেকন সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য। ইতিহাসের সমকালীন ঘটনা। আবরক্রাম্বি সাহেবের রচিত. মনোগুণ। চেম্বর্স ও নাইট সাহেবের ও পেনি ম্যাগাজিনের প্রকাশিত নানাবিধ বিদ্যা বিবরণাদি সংগৃহীত এক পুস্তক। মহাপীটরের আয়ুর বিবরণ। কলম্বসের আয়ুর বিবরণ। ক্লাইব সাহেব ও ওয়ারেন্ হেষ্টিংস সাহেবের বিষয়ে মাকলি সাহেবের প্রবন্ধ বাক্য।" প্রারম্ভেই অধ্যক্ষগণ অনেকে এককালীন দান ও মাসিক চাঁদার একটি অর্থ ভাণ্ডার খুলিলেন। পুস্তক প্রকাশার্থ দাতাদের বিশেষ বিশেষ দান ও অধিকারের বিষয়ও সাব্যস্ত হইল। সভার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য প্রসারের আয়োজন করিতেও অধ্যক্ষ-সভা উদ্যোগী হইলেন।

সভার উদ্দেশ্য সহজ সরল ভাষায় স্বল্পশিক্ষিতদের বোধার্থে অনুবাদ-পুস্তক প্রকাশ। বিশেষ বিশেষ লেখকের উপর বিশেষ বিশেষ পুস্তক অনুবাদের ভার অর্পিত হইল। সমাজের প্রথম দিকে পাদ্রী রবিন্সন, ড. রোয়ার প্রমুখ বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ইংরেজগণ এইরূপ অনুবাদ-কার্যে লিপ্ত হন। বাঙালীদের মধ্যে অনুবাদক রূপে হরচন্দ্র দত্ত, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম প্রায় প্রথম হইতেই দেখি। তবে ইঁহাদের কেহ কেহ আদৌ সমাজের পক্ষ হইতে কোন পুস্তক অনুবাদ করেন নাই; আবার নূতন নূতন লেখকও এ কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে শুধু ইংরেজী নহে, সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতেও সংকলন ও অনুবাদ-পুস্তক সমাজ কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত করেন। মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশেও তাঁহারা ক্রমে

উদ্যোগী হইয়াছিলেন। প্রথম বৎসরেই তিনখানি গ্রন্থের অনুবাদ-কার্য শেষ হইয়া যন্ত্রস্থ হয়, যথা— জে. রবিন্সনের 'রবিন্সন ক্রুসো,' ড. রোয়ারের 'ল্যাম্ টেলস ফ্রম সেক্সপীয়ার' এবং হরচন্দ্র দত্তের 'লাইফ অব ক্লাইব,' বা ক্লাইবের চরিত্র'। আরও প্রকাশ, পাদ্রী লঙ বাংলা সাময়িকপত্র হইতে একখানি সংকলন-পুস্তক তৈরি করিয়াছেন।

প্রথম বৎসরে অনুবাদক সমাজের আর একটি প্রধান কার্য— রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় বিলাতের পেনি ম্যাগাজিনের আদর্শে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামক বাংলা মাসিক পত্র প্রকাশ (১৮৫১ অক্টোবর)। পত্রিকার উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, "যাহাতে বঙ্গ-দেশের জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং এমৎ সৎ ও আনন্দজনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত [বঙ্গভাষানুবাদক] সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় 'পেনি মেগাজিন' পত্রের অনুবাদিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে অবিরত সম্যক চেষ্টা করা যাইবেক। আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহার নানাবিধ ছবি আনিবেক।" সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন পুস্তক ও পত্রিকার জন্য বিলাতের নাইট কোম্পানীর নিকট হইতে স্বল্পমূল্যে প্রচুর ব্লক আনাইয়া দিলেন। বেথুন সাহেব নিজে এই সমাজের প্রতিষ্ঠাকালে হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজের এরূপ হিতৈষী বন্ধু ১২ই আগস্ট ১৮৫১ তারিখে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন মাননীয় জে, আর. কলভিন।

সমাজের কার্যে আরও অনেক প্রখ্যাত মনীষী যোগ দিয়াছিলেন। অধ্যক্ষ-সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর,

প্যারীচাঁদ মিত্র, পাদ্রী জেমস্ লঙ্, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত (অরু ও তরু দত্তের পিতা) স্থান পাইলেন। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মাসিক চাঁদা বারো শত টাকা বাদে নিজস্ব গ্রন্থাগারের যাবতীয় বাংলা পুস্তক সমাজের হস্তে অর্পণ করেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, পাদ্রী লঙ ইহার একটি তালিকাও সমাজকে দিয়া প্রকাশিত করাইয়াছিলেন। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে বাহির হইতে লাগিল। পূর্বোক্ত পুস্তকত্রয় এই নামে ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হয়: 'রবিন্সন ক্রুসোর ভ্রমণবৃত্তান্ত', 'শেকৃসপীয়ার-কৃত গল্প' এবং 'লর্ড ক্লাইব চরিত্র'। প্রথম ও তৃতীয় পুস্তক চিত্রিত হইয়াছিল। পত্রিকা ও পুস্তক বিক্রয়ের যথারীতি ব্যবস্থা হইল। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রেস-পরিচালক পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সমাজ-প্রকাশিত পুস্তক সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের আংশিক ভার লইলেন। এই বৎসরে আরও দুই খানি বই বাহির হইল— পাদ্রী লঙ সংকলিত "সংবাদ-সার" (Selections From Native Periodical Press) এবং হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"।

কিন্তু আয় অপেক্ষা ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় সমাজের কার্য সম্পাদনে প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর মধ্যেই বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল। সমাজ ১৮৫৪ সনের প্রথমে "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার মাসিক বা বার্ষিক অধিবেশনও কিছুকাল নিয়মিত হইল না। সমাজের এইরূপ দুরবস্থার মধ্যেও পাদ্রী লঙ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে এবং বিপুল পরিশ্রম সহকারে ইহারই আনুকূল্যে 'নূতন পঞ্জিকা ১২৬২' নামে এক অভিনব পঞ্জিকা ঐ সনে (১৮৫৫-৫৬) সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিলেন। পর বৎসরে 'নূতন পঞ্জিকা ১২৬৩' নামে আর একখানি বাহির হইয়াছিল। ঐ যুগের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পঞ্জিকায়

বর্ণিত হইয়াছে।* এই সময়ে নূতন গ্রন্থ প্রকাশও একেবারে বন্ধ হয় নাই। "পল ও বর্জিনিয়া" ১৮৫৬, জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। হজসন প্রাট কলিকাতা হইতে অন্যত্র বদলি হইয়া যাওয়ায় সম্পাদকের আসন শূন্য হইল।

১৮৫৬ সনের মার্চ-এপ্রিল হইতে অধ্যক্ষ-সভার কর্মতৎপরতা পুনরায় লক্ষ্য করি। তখন প্যারীচাঁদ মিত্র মাত্র এক মাসের নিমিত্ত সম্পাদক নিযুক্ত হন। এক মাস পরেই প্যারীচাঁদের স্থলে আর. বি. চ্যাপম্যান স্থায়ী সম্পাদক হইলেন। ইহার পর দুই-এক মাস ব্যবধানে অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হইতে থাকে। সভা শুধু অনুবাদ-পুস্তক নয়, মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশেও তৎপর হইল। মৌলিক বা অনুবাদ-পুস্তক নিম্ন বিষয়ের হইবে: ১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র। ২ দেশ-প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোলের বৃত্তান্ত ; ৩ বাণিজ্য ও লোকবার্তা বিবরণ ; ৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞানশাস্ত্র ; ৫ শিল্প-বিদ্যা ; ৬ শিক্ষাবিধান ; ৭ জীবনচরিত এবং ৮ নীতিগর্ভ গল্প। ইহার সকল বিষয় না হউক, অন্ততঃ কয়েকটি বিষয়েও অবিলম্বে পুস্তক রচনা ও প্রকাশে সমাজ-কর্তৃপক্ষ উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক গ্রন্থ-রচয়িতাকে এককালীন দুইশত টাকা দক্ষিণা দেওয়া হইবে, এবং প্রত্যেক বইয়ের দুই হাজার খণ্ড বিক্রয় হইলে গ্রন্থকার আরও পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত পাইবেন। গ্রন্থের স্বত্বাধিকার সমাজের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। "বিবিধ সংগ্রহ" পুনঃপ্রকাশের জন্য ১৮৫৬ সনেই সরকারের নিকট আবেদন করা হয়।

এই বৎসরই মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্য উক্ত হারে দক্ষিণা বা পুরস্কার

* দেশ—১৩ বৈশাখ ১৩৫৯ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

ঘোষণা করা হইল। দশজন প্রার্থীর মধ্যে দুইজনের পুস্তক গ্রাহ্য হয়; কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী-কাব্য' এবং মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান'। শেষোক্তখানি উপন্যাস, এবং সমাজ কর্তৃক ১৮৫৭ সনের প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগও তাঁহারা ক্রমে বাহির করেন ডিসেম্বর ১৮৫৯ এবং সেপ্টেম্বর ১৮৬০ সনে। ১৮৫৭-৬১ সনের মধ্যে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের আরও কতকগুলি পুস্তক সমাজ কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেন। মধুসূদন ১৮৫৭ সন হইতে সমাজের সহকারী সম্পাদকও হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের বৃহৎকথা (১ম ও ২য় খণ্ড), রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের 'এলিজাবেথ', কালিদাস মিত্রের 'ভূগোল বিবরণ' এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শিল্পিক দর্শন', 'শিবজীর চরিত্র' ও 'মেবারের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয়। ১২৬৪, বৈশাখ মাস (১৮৫৭, এপ্রিল-মে) হইতে "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রকাশ পুনরায় সুরু হয়। সম্পাদক পূর্ববৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সরকারী সাহায্য উক্ত মাস হইতেই পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পত্রিকা ও কোন কোন পুস্তক যথারীতি বিক্রিত হইতে থাকে।

পত্রিকা এবং পুস্তকের ভাষাও সহজ সরল, ইহার দরুন অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ পড়িয়া সহজে জ্ঞানলাভ করিতে পারিত। মূল্যও খুবই কম ছিল। পুস্তকসমূহ যাহাতে বাংলাভাষী সকল অঞ্চলে প্রচারিত হয় সেজন্য এই সময়ে নূতন করিয়া ব্যবস্থা করা হইল। তখন এইরূপ প্রয়োজনও হয়। ঐ সময় সরকারী ও বেসরকারীভাবে বাংলাশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা বিশেষভাবে হইতে থাকে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকার-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অন্যান্য জেলায়ও আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। এই সকল বিদ্যালয় পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলার

বিভিন্ন অঞ্চলে বাইশজন সহ-পরিদর্শক নিয়োজিত হইলেন। তাঁহাদের মারফত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ন্যায় অনুবাদক সমাজও গার্হস্থ্য গ্রন্থাবলী সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেন। বস্তুতঃ সমাজ পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশক ও সরবরাহকারী স্কুলবুক সোসাইটির সঙ্গে বরাবর সহযোগিতা করিয়া আসিতেছিলেন। সমাজের দুঃসময়ে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশের ভার লন তাঁহারা। এক সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে সমাজকে একত্র করারও প্রস্তাব হয়। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবমত উভয়ে মিলিয়াও যায়। এই কথাই বলিতেছি।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র অসুস্থতানিবন্ধন অবসর লইলে "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" সম্পাদনার ভার পড়িল বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক কালীপ্রসন্ন সিংহের উপর। ১২৬৮ বৈশাখ (১৮৬১ এপ্রিল-মে) হইতে। এই সময়ে সহকারী সম্পাদক হন সমাজের সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। কিন্তু একটি বিপদ উপস্থিত হইল। সমাজের অন্যতম প্রধান কর্মী ও অধ্যক্ষ পাদ্রী লঙ্ 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের অভিযোগে ১৮৬১ সনে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ১২৬৮, আষাঢ় সংখ্যায় ১৮৬১, জুন-জুলাই 'নীলদর্পণ' নাটকখানির উপর একটি বিস্তারিত আলোচনা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পত্রিকায় এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট নিরতিশয় রুষ্ট হন। ফলে উক্ত সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশের পর, সমাজ-কর্তৃপক্ষ এখানি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

অনুবাদক সমাজের জীবনে দ্বিতীয় বার সঙ্কট উপস্থিত হইল। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি এবং অনুবাদক সমাজ, উভয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর ১৮৬২ সনের প্রারম্ভে সম্মিলিত হইলেন। সমাজ-কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গ্রন্থাগার কলিকাতা

পাবলিক লাইব্রেরির (বর্তমান 'ন্যাশনাল লাইব্রেরির' পূর্বজ) হস্তে অর্পণ করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের সংযোগের পর, অনুবাদক সমাজের পক্ষে আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য—১৮৬৩ সনের প্রথম হইতেই মাঘ ১২৬৯ পূর্বেকার 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' আদর্শে ইহারই অনুক্রম স্বরূপ "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ। এবারেও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর পত্রিকার সম্পাদনার ভার অর্পিত হইল। পত্রিকাপ্রকাশের উদ্দেশ্যও সম্পাদক বিশদরূপে বিবৃত করিলেন। আশ্বিন ১২৭৮ সংখ্যা প্রকাশান্তর রাজেন্দ্রলাল অবসর লন। প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদনায় চৈত্র ১২৮০ সংখ্যা প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই দুইখানি পত্রিকা জনচিত্তে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে ইহার প্রশস্তি করিয়াছেন। অনুবাদক সমাজ প্রকাশিত পুস্তকসমূহকে প্রশংসা করিতে না পারিলেও, বঙ্কিমচন্দ্রও এই পত্রিকাদ্বয়ের বিশেষ গুণগান করিয়াছেন।† সমাজ প্রকাশিত পুস্তকাবলীর কোন কোনটি যে বিশেষ জনাদর লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। সে যুগে বাংলা গদ্য সরল ও সহজবোধ্য করার পক্ষে অনুবাদক সমাজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া জনচিত্তে পরবর্তী কালে যে চেতনা জাগ্রত হয় তাহার মূলে এই প্রতিষ্ঠানটির সার্থক প্রয়াস নিয়ত লক্ষ্য করি।

বেথুন সোসাইটি

জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যুর (১২ আগস্ট ১৮৫১) অল্পকাল পরে, তাঁহারই নামে কলিকাতায় এই সোসাইটি বা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ সুলভ ও সরল সাহিত্য প্রচার

* সংস্করণ

† "Popular Literature for Bengal". cf *Transactions of the Bengal Social Science Association for 1870*, Vol IV.

দ্বারা স্বল্পশিক্ষিত নর-নারীর চিত্তকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানমুখী করিয়া তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষিতেরা ঐ সময় সমাজের শীর্ষে, এবং নেতৃস্থানীয়। তাঁহাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা যাহাতে হয় এবং সমবেত ভাবে শুধু আলোচনা নয়, আলোচনা-প্রসূত কর্মধারাও তাঁহারা যাহাতে গ্রহণ করেন সেই উদ্দেশ্যেই বেথুন সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। শিক্ষা, সাহিত্য বিজ্ঞান বিষয়ক নানারকম আলোচনা দ্বারা স্থায়ীভাবে বঙ্গীয় সমাজের কল্যাণ সাধনই সভার লক্ষ্য ছিল।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক এবং তৎকালীন শিক্ষা সমাজের ("Council of Education") সম্পাদক ডঃ এফ্. জে. মৌএট ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫১ তারিখে মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটরে কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে উক্ত উদ্দেশ্যে এক সভায় আহ্বান করেন। প্রাথমিক আলোচনা বা প্রতিষ্ঠা-সভায় যোগ দেন ডাঃ মৌএট ব্যতীত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ সূর্যকুমার গুডিব্ চক্রবর্তী, পাদ্রী লঙ, ডঃ স্প্রেঙ্গার প্রভৃতি। সভাপতি রূপে ডঃ মৌএট বলেন কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি এবং কৃষি-সমাজ (এগ্রিকালচ্যারাল এণ্ড হর্টিকালচ্যারাল সোসাইটি) রহিয়াছে বটে কিন্তু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাংলার সাধারণ বিদ্বজ্জনের সেখানে মেলামেশা সম্ভব নয়। এই সব স্থলে সমাজ-কল্যাণকর বিষয়াদির আলোচনার সুযোগ-সুবিধাও সীমাবদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র মিলনস্থলের প্রয়োজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ডঃ চক্রবর্তী ও ডঃ স্প্রেঙ্গার আলোচনায় যোগদান করিয়া ডঃ মৌএটের এতাদৃশ সাধু প্রস্তাবের সমর্থন করেন। ভারতহিতৈষী স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী বেথুন সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশে সভার নাম রাখা হইল— বেথুন সোসাইটি। ইহার পর কয়েকটি

প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে : "That a society be established for the consideration and discussion of questions connected with literature and science" অর্থাৎ সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের বিচার আলোচনা। আর একটি প্রস্তাবে, ধর্ম ও সমসাময়িক রাজনীতির আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিই সভায় যোগদানের সুযোগ পাইলেন।

এই দিনের এবং পরবর্তী ৮ই জানুয়ারি ১৮৫২ তারিখের অধিবেশনে সভার কার্য পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্ণীত হইয়াছিল। ক্রমে সামান্য সামান্য পরিবর্তন হইয়া এগুলি মোট পনরটিতে দাঁড়ায়। স্থির হয় যে, প্রতি মাসে এক দিন করিয়া অধিবেশন হইবে। ইংরেজি, বাংলা, উর্দু যে কোন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ বা বক্তৃতা দান চলিবে। পঠিত প্রস্তাবসমূহ সোসাইটির সম্পত্তি, এবং নির্বাচিত প্রস্তাবগুলি প্রবন্ধ-পুস্তকে ("Transactions") নিবদ্ধ থাকিবে। প্রথম প্রথম সভার একটি পেপার-কমিটি বা গ্রন্থাধ্যক্ষ-সভা থাকিবে। কোন্ কোন্ প্রস্তাব প্রবন্ধ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইবে এবং সভার আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ বিচার-বিবেচনার ভার তাঁহাদের উপর দেওয়া হয়। সোসাইটির প্রথম বৎসরের ব্যয়ভার বহন করেন ডঃ মৌএট। পরে সভ্যদের বার্ষিক চাঁদাও ধার্য কিছু হয়।

সোসাইটির প্রথম সভাপতি— ডঃ মৌএট ও প্রথম সম্পাদক— প্যারীচাঁদ মিত্র। ইহার প্রাথমিক সদস্যরূপে চব্বিশ জন* গণ্যমান্য ইংরেজ ও বাঙালীর উল্লেখ পাই। তাঁহারা ছিলেন পাঁচ জন ইংরেজ— এস্. জে. মৌএট, পাদ্রী জেমস্ লঙ, মেজর জি. টি. মার্শাল, ড. স্প্রেঙ্গার

---

* ২৩শে জানুয়ারি ১৮৫২ দিবসীয় 'বেঙ্গল হরকরায়' একুশজন সদস্যের নাম পাওয়া যায়।

ও এ. এল্, ক্লিণ্ট ; উনিশজন বাঙালী— পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সূর্যকুমার গুডিব্ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাসচন্দ্র বসু, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, নবীনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রসন্নকুমার মিত্র, গোপালচন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব পূর্ব সভা-সমিতি অপেক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোসাইটি একক্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল চলিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে প্রথম কুড়ি বৎসরের ধারাবাহিক বিবরণ সভা-প্রকাশিত প্রবন্ধ-পুস্তক এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ইহার কার্য তেমন সুনিয়মে পরিচালিত হয় নাই। প্রবন্ধ-পুস্তকও যতদূর মনে হয় প্রকাশিত হইবারও তখন সুযোগ ঘটে নাই। এই সময়ে, ১৮৮১, ১৯শে এপ্রিল যুবক রবীন্দ্রনাথ 'গান ও ভাব' শীর্ষক একটি বাংলা প্রবন্ধ সঙ্গীত সহযোগে পাঠ করেন।* এই সভায় পৌরোহিত্য করেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার এই দশকের শেষে ১৮৮৮-৮৯ সন নাগাদ বিপিনচন্দ্র পাল এইচ্. জে. এস্. কটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে "The Present Social Reactions" (বর্তমান সামাজিক প্রতিক্রিয়া") নামক একটি প্রস্তাব পড়িয়াছিলেন।

বেথুন সোসাইটির প্রথম কুড়ি বৎসরের কার্যকলাপ আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি : ১৮৫১-১৮৫৯ এবং ১৮৫৯-১৮৬৯। প্রথম

* ভারতী—বৈশাখ ১২৮৮, পৃঃ ৬-৯।

† *Memories of My Life and Times* **vol. II— By Bipin Chandra Pal pp. 111-12.**

অংশের কার্যকলাপের বিবরণ— মাসিক অধিবেশন, বার্ষিক অধিবেশন ইত্যাদির কথা সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইত। সোসাইটির প্রথম মাসিক অধিবেশন হইল ১৮৫২, ৮ই জানুয়ারি। ডঃ সূর্যকুমার গুডিব্‌ চক্রবর্তী কলিকাতার পৌরস্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রবন্ধ পঠিত হয় সংস্কৃত কাব্য সম্পর্কে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক। এইরূপে বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতা, সংস্কৃত কাব্য, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ইংরাজি সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, বিদ্যুৎ, জ্যোতিষ, শারীরতত্ত্ব, টেলিগ্রাফ, আইনকানুন, সমাজব্যবস্থা, মাদক দ্রব্য নিবারণ, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বর্তমান সভ্যতা, ভারতবর্ষের ও ইউরোপের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক, বিজ্ঞানের উন্নতির নানা পর্যায়, চীন দেশ ও চীনজাতি, ভূমিবণ্টন ব্যবস্থা, বাংলার কৃষিসম্পদ, ইংরেজী শিক্ষা ও সমাজের উপর তাহার প্রভাব, বাংলার নারীসমাজ, স্ত্রীশিক্ষা, শারীর চর্চা, বঙ্গবিদ্যালয় ও বাংলা শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা হইত। এই অংশে পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধের সংখ্যা দেখিতেছি সাতষট্টি। ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটকাবলী হইতে অংশবিশেষ পাঠ সভার একটি আকর্ষণীয় বস্তু ছিল।

পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে মাত্র দু-তিনটির কথা এখানে একটু বলি। ১৮৫৩ সনের একটি মাসিক অধিবেশনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহার সম্বন্ধে ১২ মার্চ ১৮৫৩ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন: "বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য এবং সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন

প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পূর্ব বৎসরে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পড়িয়াছিলেন। বাংলা কবিতার অশ্লীলতার উপর জোর দিয়া সভায় পূর্বে যে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহারই প্রতিবাদে কবি রঙ্গলাল উহা লেখেন। সরকারী ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল ই. গুডউইন ২রা মার্চ ১৮৫৪ তারিখে সোসাইটির অধিবেশনে "Union of Science, Industry and Arts" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে বিজ্ঞান, শিল্প এবং কলা এই তিনটি বিষয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে সমাজ-নেতৃবর্গের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করেন। ইহারই ফলে কলিকাতায় একটি শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই বিদ্যালয়টিই পরে 'গবর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট' নামে আখ্যাত হয়। ক্রমে ইহা একটি কলা মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। বিখ্যাত বাগ্মী ভারতহিতৈষী জর্জ টমসন ১৮৫৬ সনের শেষে ভারতে দ্বিতীয়বার আগমন করেন। তিনি বেথুন সোসাইটিতে "উত্তর-আমেরিকা পরিদর্শনের স্মৃতি" বিষয়ক একটি বক্তৃতা দিলেন।

সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভার অনুমতিক্রমে এই সকল জ্ঞানগর্ভ প্রস্তাবের কোন কোনটি ঐ সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশই সোসাইটির দপ্তরে জমিয়া যায়। তখন ইহা হইতে বাছাই করিয়া কিছু কিছু 'ট্রান্‌জ্যাকসন্‌স' নামক প্রবন্ধ-পুস্তক বাহির করা হইতে থাকে। ১৮৫৪, ১৮৫৫ এবং ১৮৫৭ সনে পর পর চারি খণ্ড প্রবন্ধ-পুস্তক সোসাইটি প্রকাশিত করিলেন। এই সকল সমাজহিতকর বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদের কথাও হইয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ তাহা কার্যে রূপায়িত হয় নাই। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের

মধ্যেই ঢাকায় ইহার শাখাস্বরূপ 'ব্রাঞ্চ বেথুন সোসাইটি' স্থাপন করেন ঢাকা কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র এবং পরবর্তীকালের বিখ্যাত ডেপুটি রামশঙ্কর সেন। তিনি মুল সোসাইটিতে 'কৃষির উন্নতি' সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন।

প্রথম আট-নয় বৎসরের সোসাইটির কর্মব্যবস্থার কথাও এখানে সংক্ষেপে বলা যাক্। প্রেসিডেন্ট পদে এই ক'বৎসরের মধ্যে পর পর বৃত হন— ডঃ মৌএট, হজসন প্রাট, কর্ণেল গুডউইন, ডঃ বেডফোর্ড, জেমস হিউম। প্রথম হইতেই সহকারী সভাপতি ছিলেন দুইজন করিয়া একজন ইউরোপীয় ও একজন বাঙ্গালী। তাঁহারা কর্ণেল গুডউইন ক্যাপ্‌টেন ডব্‌লিউ এন্. লীজ্, ডঃ বেডফোর্ড, ডঃ নর্ম্যান চেভার্স, ডাঃ সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, পাদ্রী লঙ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন এবং রাধানাথ শিকদার। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম দুই বৎসর সম্পাদক হইলেন, পরে সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র। 'কমিটি অব্ পেপার্স' বা গ্রন্থাধ্যক্ষ সভায় প্রতি বৎসর তিন জন করিয়া সদস্য থাকিতেন। এই ক'বৎসরে তাঁহারা ছিলেন জি, টি, মার্শাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডব্‌লিউ. গর্ডন ইয়ং, হেনরি উড্রো এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র। চব্বিশ জন সদস্য লইয়া সভার সূচনা, কিন্তু ইহার সুনাম এত বাড়িয়া যায় যে, পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যেই ইহার সদস্য সংখ্যা বাড়িয়া যায় তিন শতে। দ্বিতীয় বৎসরে সদস্যদের নিকট হইতে স্বেচ্ছামূলক ভাবে চাঁদা গ্রহণ সুরু হয়। ১৮৫৯ সন নাগাদ সভ্যদের বাৎসরিক চাঁদা মাথাপিছু চারি টাকা নির্ধারিত হইতে দেখি।

সোসাইটি নানা কারণে কতকটা হীন অবস্থায় পতিত হইল। এই সময় 'ধর্ম্ম' বিষয়ক আলোচনার নিষিদ্ধতা তুলিয়া দিবার কথা হইলে

ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৫৯ আগস্ট মাসে ইহার সভাপতি পদ গ্রহণ করিলেন। ইহাকে পুনরায় সক্রিয় করিবার নিমিত্ত তাহার উপদেশে একটি উপায় অবলম্বিত হইল। সভার কার্য ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক একজনের উপর এক এক শাখার ভার দেওয়া হয়: ১ শিক্ষা, হেনরি উড্রোর নেতৃত্বে; ২ সাহিত্য এবং দর্শন, অধ্যক্ষ কাওয়েলের নেতৃত্বে; ৩ বিজ্ঞান এবং কলা, এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক মিঃ স্মিথের নেতৃত্বে; ৪ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য, ডঃ নর্ম্যান চেভার্সের নেতৃত্বে; ৫ সমাজবিজ্ঞান, পাদ্রী লঙের নেতৃত্বে; ৬ স্ত্রীজাতির উন্নতি, রমাপ্রসাদ রায়ের নেতৃত্বে। ১০ই নবেম্বর ১৮৫৯ হইতে ডাফের অধ্যক্ষতায় সভার মাসিক অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হইল। উক্ত শাখাগুলির পরিচালকগণ নিজ নিজ বিষয়ের আলোচনা-গবেষণায় রত হন। সোসাইটির দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ ১৮৫৯-৬৯ সনের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা হইতেও দেখি। পূর্বেকার 'পেপার-কমিটির' অস্তিত্ব আর রহিল না।

এই দশ বৎসরের মধ্যেও বহু বিদগ্ধ ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে এখানে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বক্তৃতা দেন। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস— ইউরোপীয় ও ভারতীয়, পুরাতত্ত্ব, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির উপর সাতচল্লিশটি প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা দান ও আলোচনা চলিয়াছিল। প্রবন্ধ-রচয়িতা এবং বক্তাদের মধ্যে এবারে অনেক নূতন ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। সভাপতি রেভাঃ ডক্টর ডাফ 'দেশীয়দের শিক্ষার সূচনা ও উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ, এবং ইতিহাসে কাহিনী ও সত্যকার ঘটনার গুরুত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাওয়েল। হিন্দু নারী ও দেশের উন্নতির সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক, আলিপুর প্রদর্শনীর নিরিখে কৃষি— এই দুইটি বিষয়ে প্রবন্ধ পড়িতে দেখি

কিশোরীচাঁদ মিত্রকে। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক 'ভারতবর্ষের আর্য-ভাষাসমূহ' এবং 'প্রাচীন ভারতবর্ষের লিপি ও সংস্কৃত অক্ষরমালা' শীর্ষে দুইটি সারবান প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেন উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও সোসাইটিতে দুইটি বক্তৃতা করেন। 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা' সম্বন্ধে হেনরি উড্রো, এ দেশীয়দের মনে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব বিষয়ে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, কিয়ৎকাল ব্যবধানে এদেশে সেন্সাস গ্রহণের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার শীর্ষে রেভাঃ লালবিহারী দে, স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার, ভারতে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে শিবচন্দ্র নন্দী প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক মেজর ম্যালেসন কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প, শারীর-চর্চা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেকে এখানে আলোচনা করেন। এগুলি হয় প্রবন্ধ-পাঠ নতুবা বক্তৃতা-দান দ্বারা। বেথুন সোসাইটিতে দুইটি বিশেষ বক্তৃতা হইল। ১৮৬৬, ১১ই ডিসেম্বর ভারতহিতৈষিণী মহিলা মিস্ মেরি কার্পেণ্টার 'সংশোধন বিদ্যালয় ও নারী-অপরাধিনীদের উপর ইহার প্রভাব' শীর্ষক একটি মূল্যবান বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন মুথু কুমারস্বামী তাঁহার উত্তর-ভারত পরিক্রমা সম্পর্কে।

সোসাইটি পুনর্গঠিত হইলে রাজা রাধাকান্ত দেব এবং রাজা কালীকৃষ্ণ অনারারি সদস্য পদে নির্বাচিত হন। সভাপতি পদে পর পর কয়েকজন মনীষী বৃত হন। ডঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ১৮৬৩ সনে ভারত-ত্যাগ করিলে রেভাঃ জোসেফমুলেন্স তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার পরে সভাপতির পদ গ্রহণ করেন ঐতিহাসিক মেজর ম্যালেসন।

তিনি ১৮৬৬ সনে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার পর সভাপতি হন বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার। তিনি অতীব দক্ষতার সহিত দীর্ঘকাল সভার কার্য পরিচালনা করেন। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এইচ্. জে. এস্. কটনও পরে সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র অসুস্থতানিবন্ধন ১৮৬০, মার্চ মাসে অবসর গ্রহণ করিলে, কৈলাস চন্দ্র বসু প্রথমে সাময়িক ও পরে স্থায়ীভাবে সম্পাদকের কার্য করেন। তিনিও বহু বৎসর এই কার্যে বৃত থাকেন। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও বিভিন্নশাখার অধ্যক্ষদের লইয়া অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইত। ১৮৬৯ সন নাগাদ সভ্য সংখ্যা তিন শতের উপর ছিল। বেথুন সোসাইটি উচ্চশিক্ষিতদের সভা বা মিলন ক্ষেত্র লইয়া সমাজ চেতনা তথা দেশাত্মবোধের উন্মেষে যে কতখানি কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল বলিয়া শেষ করা যায় না।

শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা, ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া

বেথুন সোসাইটিতে ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু এই তিন ভাষাতেই প্রবন্ধপাঠ চলিত। তবে ইংরেজীর মাধ্যমেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আলোচনাদি পরিচালিত হইত। শুধু মাত্র বাংলা ভাষার অনুশীলনের জন্য কলিকাতার অনতিদূরে সাঁতরাগাছিতে এবং দক্ষিণ বোড়ালে যথাক্রমে বঙ্গভাষানুশীলন সভা এবং 'বিদ্বন্ মনোরঞ্জিনী সভা' স্থাপিত হয় ১৮৫২-৫৩ সনের ভিতরে। শেষোক্ত সভার অষ্টম ও নবম নিয়মে ইহার মূল উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হয়: "এই সভায় যে কোন প্রশ্ন হইবেক তাহা সভা কর্তৃক লিখিত হইয়া পঠিত হইবেক" এবং "কোন প্রবন্ধ বঙ্গভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় লিখিত হইবেক না।"

কিন্তু কলিকাতায় নেতৃস্থানীয়েরা সমাজকল্যাণকর আরও বহু বিষয়ে অগ্রসর হইলেন। তাহার মধ্যে একটি হইল— শিল্পবিদ্যোৎ-

সাহিনী সভা। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ ও বেথুন সোসাইটির ন্যায় এই সভায় ইংরেজী ও বাঙালী বিদগ্ধজনেরা হাতে হাত মিলাইলেন। কর্নেল গুডউইন ২রা মার্চ ১৮৫৪ তারিখে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে "Union of Science, Industry and Arts" বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন তাহার উল্লেখ করিয়াছি। গুডউইন উক্ত বক্তৃতায় শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ইহার পরে এই উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠানপত্রও তিনি রচনা করিলেন। অনুষ্ঠানপত্র পাঠে জানা যায়, নিয়মিত বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা ও বিচার-আলোচনার ভিত্তি স্বরূপ কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। যেমন একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক তেমনি সাধারণের মনে সুরুচি ও শিল্পবোধ জাগ্রত করাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে শিল্প-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশী বিদেশী সকল শিল্পীরই চিত্র ও কারুকর্মাদি ইহাতে স্থান পাইবে। যে-সব শিল্প-নিদর্শন উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদের পুরস্কৃতও করা হইবে। আগেকার শিল্পনিপুণ ছাত্রদেরও বৃত্তির ব্যবস্থা করা দরকার; মাঝে মাঝে যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতারও ব্যবস্থা হইবে। শিল্প-জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত শিল্পের উপরে প্রবন্ধ-সম্বলিত সাময়িক পুস্তকও প্রকাশ করা সভার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য। প্রথমেই তিনটি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও গুডউইন উক্ত পত্রে ব্যক্ত করেন, যথা— (১) একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, (২) মিউজিয়ম এবং চারু ও কারু শিল্পের নিদর্শন-সংগ্রহ, (৩) কলিকাতায় উক্ত উদ্দেশ্যে একটি শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন, আর অনুরূপ শিল্প-বিদ্যালয় সমূহকে উৎসাহ দান। সভা গঠনেরও কতকগুলি খসড়া নিয়ম তিনি উক্ত পত্রে লিপিবদ্ধ করিলেন।

১৮৫৪, মার্চ মাসের মধ্যেই অনুষ্ঠানপত্রখানির নিরীখে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বেথুন সোসাইটির বহু গণ্যমান্য সভ্য এই সভারও

সদস্য হইলেন। সভার সভাপতি হইলেন কর্নেল গুডউইন্ স্বয়ং, সম্পাদক হন হজসন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইঁহারা বাদে অধ্যক্ষ সভায় ছিলেন—সিসিল বিডন, পাদ্রী লঙ, ডঃ স্থর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ গণ্যমান্য পনর জন ইংরেজ ও বাঙালী। কিছুকাল পরে রাধানাথ শিকদার, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতিও অধ্যক্ষ সভায় গৃহীত হন। অনুষ্ঠানপত্রে উল্লিখিত নিয়মাবলীর ভিত্তিতে অধ্যক্ষ-সভা নিয়মপত্রও রচনা করিয়া লইলেন।

সভার প্রধান কাজ একটি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ৬ই এপ্রিল (১৮৫৪) সম্পাদকদ্বয়ের স্বাক্ষরে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত একখানি উদ্দেশ্যপত্র সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। ইহার প্রথম দুই অনুচ্ছেদে বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়াদি এইরূপ বিবৃত হইয়াছে :

"শিল্পবিদ্যা শিক্ষার উৎসাহার্থে এতন্নগরে এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎকর্তৃক আদেশিত হইয়া আমরা সাধারণের শিক্ষোপযুক্ত একটি প্রকাশ্য বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিমিত্ত মহাশয়দিগের সাহায্য যাচ্ঞা করিতেছি। উক্ত বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা, কাষ্ঠ, ধাতু প্রস্তরাদির তক্ষণবিদ্যা ও মৃৎপাত্র পুত্তলিকাদির গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

"দেশীয় শিল্পসাধ্য ব্যবসায়ের উৎসাহ ও তদুন্নতি চেষ্টা, এতদ্দেশে চিত্রকর ও তক্ষকের অভাব নিরাকরণ করা, এবং হিন্দু মোসলমান ও ইংরাজ সন্তান যাহারা কিঞ্চিৎ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে উপজীবিকা প্রাপ্তির ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যবসায় প্রস্তুত করা প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য, এবং তৎকার্য্যসকল করণাভিপ্রায়ে এই সাহায্য প্রত্যাশা করা যাইতেছে।"

এই উদ্দেশ্যপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। ইহার কার্যও যথারীতি অগ্রসর হইতে থাকে। ইংরেজ এবং বাঙালী প্রধানেরা

বিদ্যালয়ের নিমিত্ত অর্থ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ২৫শে মে'র মধ্যে তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়— এককালীন তিন হাজার টাকার উপর এবং মাসিক চাঁদার প্রতিশ্রুতি এক শত ছত্রিশ টাকা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পর ১৮৫৪ সনের ১৬ই আগস্ট তারিখে কলিকাতাস্থ চিৎপুরে এই শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

সাধারণের মধ্যে শিল্পানুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত সভা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বনেও অগ্রণী হন। শিল্প-প্রদর্শনী এই দ্বিতীয় উপায়। তাঁহারা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সবে চারু ও কারু শিল্পের চর্চা শুরু করিয়া দিয়াছিল। তথাপি শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁহাদের কার্যের নমুনা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়। এই ধরনের প্রথম শিল্প-প্রদর্শনী সভার আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতা—টাউন হলে ১৮৫৫ সনের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রায় পক্ষকাল যাবৎ এই প্রদর্শনী সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পকর্ম বাদে বাঙালী প্রধানদের গৃহে সংরক্ষিত চিত্রাদি এবং সাধারণের শিল্পকর্মের বহু নিদর্শনও প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা এখানে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বহু ইউরোপীয় শিল্পীরা তাঁহাদের শিল্পকর্ম্ম প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন :

"আমরা টৌনহালে গমন করিয়া তথাকার মনোহর শোভা দর্শন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, কর্ণেল গুডউইন সাহেব অল্প দিবসের মধ্যে এত চিত্র প্রতিমূর্তি ও মৃৎ মূর্তি এবং হাড়ের ও কাচের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, আমরা এমত বিবেচনা করিতে পারি নাই, টৌনহালের যে দিগে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছি, সেই দিগের মনোরম শোভা দর্শন করত চক্ষের সার্থকতা জন্মিয়াছে, যাঁহারা দেখেন নাই তাঁহারা আর দেখিতে বিলম্ব করিবেন না।"

ছাত্রদের শিল্পকর্মের প্রদর্শনীর আয়োজন প্রায় প্রতি বৎসরই সভা-কর্তৃপক্ষ করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে ভীষণ অর্থাভাব দেখা দিলেও শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা একাদিক্রমে দীর্ঘ দশ বৎসর কাল বিদ্যালয়টি পরিচালনা করিয়াছিলেন। অবশ্য ১৮৫৬ সন হইতে সভা বিদ্যালয়ের জন্য সরকার হইতে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পাইতে থাকেন, কিন্তু ইহার উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের পক্ষে এ সাহায্য আদৌ পর্যাপ্ত ছিল না। যাহা হউক, সভা প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্প-কর্মের যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন তাহাতে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে কারু ও চারু শিল্পের প্রতি অনুরাগ ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। শিল্প-বিদ্যোৎসাহিনী সভা ১৮৬৪ সনের ২৯শে জুন জানুয়ারি শিল্পবিদ্যালয়টি সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।*

এই যুগেই ফোটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র চারুশিল্পের একটি অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। শিল্প-বিদ্যালয়েও ১৮৫৭ সন নাগাদ ফোটোগ্রাফি অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া ধার্য হইয়াছিল। এদেশে ফোটোগ্রাফির বহুল প্রচার ও উন্নতি কল্পে ১৮৫৬ সনের ২রা জানুয়ারী কলিকাতায় 'ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অব্ ইণ্ডিয়া' স্থাপিত হইল। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ডঃ এফ্. জে মৌএট ও অন্যান্য সভ্যগণ। এই সভার সভাপতি হইলেন মৌএট স্বয়ং; আর কোষাধ্যক্ষ ও সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সোসাইটির কর্ম পরিচালনার নিমিত্ত একটি অধ্যক্ষ-সভা বা কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইলেন ইহার শুধু কোষাধ্যক্ষ। প্রথম দু'তিন বৎসর সভাটি অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে পরিচালিত হইয়াছিল। ইউরোপের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আলোকচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তন কল্পে সোসাইটি বিশেষ উদ্যোগ করেন।

* *General Report on Public Instruction, etc. for 1864-65*, pp 23-4.

আলোকচিত্র উপযোগী যন্ত্রপাতি ও মালপত্র এদেশে সরবরাহ করাইতেও তাঁহারা যত্নপর হন।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরেই কোষাধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে হইয়া একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এই সময় সরকার পক্ষে আইন-সচিব স্যর্ জন পিটার গ্রাণ্ট ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিচার-বৈষম্য দূর করিবার মানসে একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করেন। ইংরেজরা টাউনহলে সভা করিয়া ইহার ঘোর প্রতিবাদ করিল। ভারতবাসীদের তরফে বাঙালী প্রধানেরাই ঐ স্থানে আর একটি জনসভার অনুষ্ঠান করিয়া উক্ত সরকারী প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। এই সভার অন্যতম বক্তারূপে সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলাল এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে, এদেশে যে-সব ইংরেজ আসে তাহার এক প্রধান অংশ বিলিতী সমাজের 'আবর্জনা'! রাজেন্দ্রলালের এই উক্তির ফলে ইংরেজ মহলে ঘোর বাদানুবাদ সুরু হয়। ফোটোগ্রাফিক সোসাইটিতে ইংরেজ সদস্যেরা সংখ্যাধিক্য ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশের ভোটে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি হইতে অপসারিত হন। ১৮৫০ সনেও এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল রামগোপাল ঘোষকে লইয়া। ১৮৪৯-৫০ সনে ঐরূপ আইনের খসড়া লইয়া ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। রামগোপাল ঘোষ শেষোক্তদের মুখপাত্রস্বরূপ একখানি পুস্তক প্রকাশ করায় এবং উক্ত আইন সমর্থন করায় কৃষিসমাজের (এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকাল-চারাল সোসাইটি) সহকারী সভাপতির পদ হইতে অধিকাংশের ভোটে অপসারিত হইয় ছিলেন। সমাজ-কর্তৃপক্ষের এই কার্যের বিরুদ্ধে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' তীব্র মন্তব্যও করিয়াছিলেন।

সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি

এই সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। তাঁহার কলিকাতা— কাশীপুরস্থ ভবনে ১৮৫৪ সনের ১৫ই ডিসেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এই সমিতি স্থাপিত হয়। নাম হইতেই প্রকাশ, সমাজের উন্নতিসাধনে সমবেতভাবে প্রয়াস করাই ইহার উদ্দেশ্য। সমিতির প্রথম দিনের সভায় ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ নির্ণীত হইল : স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বাল্য-বিবাহ বর্জন, বহু-বিবাহ প্রচলন নিরোধ। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করার প্রস্তাবও সমিতি এই প্রথম সভাতেই গ্রহণ করেন। এই সময় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহকে আইনসিদ্ধ করাইবার জন্য বিশেন প্রযাসী হইয়াছিলেন।

সমিতির কার্য পরিচালনার্থ একটি অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই সভা ছিল সম্পূর্ণ স্বদেশীয়, কোন বিদেশী ইহাতে স্থান পান নাই। অধ্যক্ষ-সভা এই সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইযা গঠিত হইল : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি ; রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ সেন, দিগম্বর মিত্র, যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক— সদস্য ; কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত— সম্পাদক। অধ্যক্ষ-সভার সদস্যগণ ব্যতীত বহু সমাজকর্মী এবং সাহিত্যসেবী ইহাতে যোগদান করেন। তাঁহারা সভা-সমিতির সাধারণ অধিবেশনগুলিতে সোৎসাহে যোগদান করিতেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সে যুগে ভবানীপুর হইতে কাশীপুর গমনান্তর অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে

এবং সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনাদিতে যোগ দিতেন এবং কার্যনিয়ন্ত্রণে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

সমিতি কয়েকটি কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। বহুবিবাহ নিবারণকল্পে তাঁহারা সর্বপ্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৫৫ সনের প্রারম্ভে একখানি আবেদনপত্র পাঠাইলেন। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়নকল্পে সমিতি কতকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব করিয়াও একখানি আবেদন প্রেরণ করেন; ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাবিত আইনের পরিপূরকস্বরূপ ছিল। অন্তর্জলী প্রথার বিলোপেও তাঁহারা অগ্রণী হন। সমিতি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে তৎপর হন। কিশোরীচাঁদের কাশীপুরস্থ বাসভবনে একটি বালিকা শিক্ষালয় সমিতির আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলার কৃষকদের অবস্থা বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য অধ্যক্ষ সভা এক পাঁচশত টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং পাদ্রী লঙ্ বিচারক নিযুক্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ইহার পরিবর্তে সমিতি উক্ত বিষয়ে মৌলিক এবং গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করিবেন স্থির হয়। দুই বৎসরের মধ্যেই সমিতি কতকগুলি কার্যে সাফল্য লাভ করিলেন। সম্পাদকদ্বয় দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্টে এই প্রকার সাফল্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "সংসাধিত পরিবর্তনের গুরুত্ব দর্শন করিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না।"*

বিদ্যোৎসাহিনী সভা

সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতির পরই কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার নাম উল্লেখ করিতে হয়। তবে এ সভার সমাজ-

* এই প্রসঙ্গে "কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র"—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, পৃ. ১০০-১১১ দ্রষ্টব্য।

সেবা একটি প্রধান লক্ষ্য হইলেও, মূল উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন এবং সাহিত্যসেবীদের বিবিধ উপায়ে উৎসাহ দান। জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ-পরিবারের চতুর্দশবর্ষীয় যুবক কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্যের চর্চার জন্য একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেন ('সংবাদ প্রভাকর,' ১৪ জুন ১৮৫৩)। ইহা ক্রমে বিদ্যোৎসাহিনী সভার আকার ধারণ করে। ১৮৫৫ সনে এই সভার আনুকূল্যে বিদ্যা তথা সাহিত্যানুশীলন নিয়মিতরূপে আরব্ধ হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বরচিত কবিতা প্রবন্ধাদি এখানে পাঠ করিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ সুধী সাহিত্যসেবী ও মনীষিগণ বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন এবং এখানকার সাহিত্যাদি আলোচনায় বিশেষভাবে যোগ দিতেন। সে যুগের বিখ্যাত ইংরেজ-শিক্ষাব্রতীরাও কেহ কেহ আহূত হইয়া ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে এখানে বক্তৃতা দিতেন।

সভার একখানি মুখপত্র ছিল— 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা'। এখানি সদস্যদের রচনায় পূর্ণ হইয়া প্রতিমাসে প্রকাশিত হইত। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদের পুরস্কারদানেরও ব্যবস্থা ছিল। সাহিত্যসেবীদের উৎসাহ দানে রত থাকিয়া বিদ্যোৎসাহিনী সভা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতে থাকেন। বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ দিবসে সভা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ইহার পক্ষে সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে একখানি মানপত্র দেন। ভারতবর্ষের অকৃত্রিম সুহৃদ্ পাদ্রী লঙের বিলাতযাত্রার দিন, ১লা মার্চ ১৮৬২ তারিখে সভা তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভার নেতৃত্বে ১৮৫৬ সনে কলিকাতায় বিদ্যোৎ-

সাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। প্রকাশ্যভাবে ইহার দ্বার উন্মোচন করা হয় ১৮৫৭ সনের ১১ই এপ্রিল। এই সময় হইতে কলিকাতার নব্যশিক্ষিত ধনী সন্তানগণ নিজ নিজ আবাসে যেমন আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) ভবনে, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাটীতে— রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। পাইকপাড়া সিংহদের বেলগাছিয়া নাট্যশালা, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বউবাজার নাট্যশালা প্রভৃতিও ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল সখের নাট্যশালার পরিণতি দেখি ১৮৭২ সনের ডিসেম্বরে প্রারব্ধ ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় রঙ্গালয় নামক সাধারণ প্রবেশ্য রঙ্গালয়ে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার কর্তৃপক্ষের রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় যে দূরদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহা কখনও ভুলিবার নয়। জাতির জীবনে নববল সঞ্চারে রঙ্গালয়ের দান যথেষ্ট। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'বেণীসংহার নাটক', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রোমোর্বশী নাটক'ও 'সাবিত্রী-সত্যবান নাটক' পর পর সাড়ম্বরে অভিনীত হইয়াছিল।

সমাজসেবা ছিল এই সভার আর একটি অঙ্গ, প্রথমেই ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে সভা আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। বিধবা-বিবাহের সমর্থনে সভা ব্যবস্থাপক সভায় একটি স্মারকলিপি প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। প্রথম প্রথম যাঁহারা বিধবা-বিবাহ করিবেন তাঁহাদের প্রত্যেককে এক সহস্র টাকা করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এই সভার পক্ষে। কলিকাতার সামাজিক জীবনকে শুদ্ধ সংযত করিবার নিমিত্তও বিদ্যোৎসাহিনী সভা একাধিক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।*

* কালীপ্রসন্ন সিংহ (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা)— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ ৯-২৫ দ্রঃ।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি

নাম দেখিয়া এ সভাটিকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া আমাদের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ছিল পূর্ব পূর্ব সভা-সমিতির মত একটি সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান। এই সভার উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়—সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলনে (Culture of Literature and Science)। প্রেসিডেন্সী কলেজের সিনিয়র বা উচ্চশ্রেণীয় ছাত্রেরা মিলিয়া উক্ত উদ্দেশ্যে ১৮৫৭ সনে এই সোসাইটি গঠন করেন। উদ্দেশ্য অনুযায়ী এখানে কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইত। ১৮৫৮ সনে অনুষ্ঠিত বেথুন সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে পূর্ব বৎসরের যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাহাতে এই সভাটির গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়। এই সভায় মাঝে মাঝে আহূত হইয়া মনীষী ও শিক্ষাব্রতীরা শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতির উপরে বক্তৃতা দিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরবর্তী কালের বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের বিশেষ প্রভাব ছিল। তখনও তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সোসাইটির অধিবেশনে প্রায়ই পাদরী লঙ্‌ ও ইউনিটেরিয়ান পাদরী সি. এইচ্‌ এ. ড্যাল উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় যোগ দিতেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। তিনি ইংরেজী কেশব-জীবনীতে এই সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সোসাইটির কোন কোন অধিবেশনে লঙ্‌ ও ড্যাল সাহেবের মধ্যে কৌতুককর বিতর্ক উপস্থিত হইত ; তাহাতে শ্রোতা ছাত্রদল একদিকে যেমন আনন্দ পাইত অন্যদিকে তেমনই নানারূপ জ্ঞান এবং উপদেশও লাভ করিত। সাহিত্য বিজ্ঞান ব্যতিরেকে ধর্মের মূল তথ্যাদি সম্পর্কেও এখানে আলোচনা হইত।

সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে একটিবারমাত্র এই সোসাইটির অধি-

বেশনের কথা জানিতে পারিয়াছি।* প্রেসিডেন্সী কলেজে ২০শে আগস্ট ১৮৫৭ তারিখে এই অধিবেশন হয়। সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক ডঃ এইচ. হেনিউর পৌরোহিত্য করেন। প্রাথমিক ভাষণে তিনি এই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করেন যে, এরূপ একটি হিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রসমূহ উদাসীন রহিয়াছেন। ইহার পর এ দিনকার বিশেষ বক্তা শিক্ষাব্রতী কার্ক প্যাট্রিক 'মানুষের কর্তব্য' শীর্ষে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার পর আলোচনায় যোগদান করিয়া পাদরী ড্যাল অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি কথা বলেন। তাঁহার মতে মানবজাতির সামাজিক উন্নতিই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি মানুষ শক্তি, জ্ঞান, ন্যায় এবং প্রেম হইতে সঞ্জাত। আমাদের প্রধান কর্তব্য—নিজেদের, বন্ধুবান্ধবদের, প্রতিবেশীর ও সমগ্র মানব-সমাজের হিতসাধন।

সোসাইটির পরিচালকগণ ইহাকে বড়বাজারস্থ ফেমিলি লিটারারি ক্লাব বা গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য ১৮৫৮, ২৯শে আগস্ট আবেদন জানান। এই সমাজ উক্ত প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন এবং ইহাকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ

এই সাহিত্য-সমাজ † বড়বাজার-নিবাসী বিখ্যাত রামমোহন মল্লিকের ভবনে ১৮৫৭ সনের ২৭শে এপ্রিল স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা প্রসাদদাস মল্লিক রামমোহনের পৌত্র। ধনীর দুলাল হইয়াও প্রসাদদাস সাহিত্য-প্রীতি বশে এই সমাজ দীর্ঘকাল পালনপোষণ

* *The Englishman*, 20th August 1857.

† ইংরেজী নাম—"Burrabazar Family Literarry club"

করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ইহার স্থায়ী সম্পাদক। কলিকাতার সুবিখ্যাত ইংরেজ ও বাঙালীরা সভাপতি পদে বৎসর বৎসর বৃত হইতেন। পাদ্রী লঙ্ সমাজের সভাপতিত্ব করেন ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৬ সন এবং পরে ১৮৭১ হইতে ৭২ সন পর্যন্ত। পাদ্রী কে, এস, ম্যাকডনাল্ড মধ্যবর্তী সময়ে কয়েক বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন। সমাজের ষোড়শ অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি পদে বৃত হন।

সভার প্রথম নিয়ম ছিল— প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান করা হইবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। ১৮৫৯ সন হইতে পাদ্রী লঙের উপদেশে নিয়ম বদল হইয়া ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলিবে স্থির হয়। সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, শিক্ষা সমস্যা, সমাজ সংস্কার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের প্রসার প্রভৃতি বিবিধ হিতকর বিষয়ের উপর এখানে প্রবন্ধ পাঠ হইত, কখনও কখনও বক্তৃতাও চলিত। সমাজের কার্যকারিতায় মুগ্ধ হইয়া কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু মনীষী ও সুধী ব্যক্তি ইহার অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। পাদ্রী ড্যাল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালবিহারী দে, বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিতেন। নবম বার্ষিক অধিবেশনে (২৭ এপ্রিল ১৮৬৬) পাদ্রী লঙ্ তাঁহার ইতিহাস প্রসিদ্ধ বক্তৃতা দেন "Social Science—its Utility for India" বা ভারতবর্ষে সমাজবিজ্ঞান চর্চার উপকারিতা সম্পর্কে। এই বিষয়টি লইয়া কিছুকাল আলোচনা চলে। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে মিস্ মেরী কার্পেণ্টারের আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতায় 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশন' বা 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদ' গঠিত হয়।

সমাজ অন্যান্য হিতকর কার্যেও অবহিত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ বর্ষে

কৃষি বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধের জন্য উৎকৃষ্ট লেখকদের পুরস্কৃত করেন। সমাজ-কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে একটি অ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়ও পরিচালনা করিতেন। বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজ জ্ঞানানুশীলন এবং সমাজ-সেবার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে।*

অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাবোধিনী সভা

এত দিন পর্যন্ত নব্যশিক্ষিতেরা নিজেদের এবং সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়ের আলোচনা-গবেষণায় রত ছিলেন। প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতার মাধ্যমেই এই সকল বিষয়ের আলোচনা চলিত, কিন্তু ক্রমে তাঁহারা কার্যেও অগ্রসর হইলেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক হইতে তাঁহারা বিশেষ ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হন। এই সময়কার নবলব্ধ ভাবধারা কার্যে সহায় হয়। আর ইহার ফলে বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সংস্কৃতি পরিপূর্তি লাভ করিতে থাকে। সমাজের অর্দ্ধেক অংশ নারী। নারী সমাজের শিক্ষা ও সাহিত্য-মূলক সর্ববিধ কর্মের সূচনাও হয় এই দশক হইতে। এই কথাই এখন বলিতেছি।

নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ অনুভব করিতে লাগিলেন, এযাবৎ সমাজোন্নতির যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে, নারীজাতির যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাব হেতু তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। বালিকা বিদ্যালয়ে দশ-এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত বালিকারা অধ্যয়ন করিতে পাইত। ইহার পরই বিবাহ হওয়ায় প্রাথমিক স্তরেই তাহাদের পাঠ বন্ধ হইয়া যাইত। যতটুকু শিক্ষা তাহারা লাভ করিত, তাহা প্রায়ই ভুলিযা গিয়া নিরক্ষরের পর্যায়ে গিয়া পড়িত। পরিবার বা সমাজের ইহা কোন কাজে আসিত

* 'বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য-সমাজে'র বিশদ বিবরণ ১৩৩৮ হইতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের 'সুবর্ণবণিক সমাচারে' প্রকাশিত ড. শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহার ধারাবাহিক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

না। ১৮৬১ সনের ৩রা অক্টোবর সাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে (পরবর্তীকালের আদি ব্রাহ্মসমাজ) সুবিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে একটি জনসভার আয়োজন হয়। এই সভার আহ্বায়ক কেশবচন্দ্র সেন তৎকালীন নারীশিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

ইহার দুই বৎসর পরে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ১৮৬৩ সনে ব্রাহ্মবন্ধু সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার একটি বিশেষ কার্য হয় নারীজাতির উন্নতিসাধন। প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার পরিপূরকরূপে এই সভার সভ্যগণ দ্বারা 'বয়স্কা নারীগণের' শিক্ষার্থে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' সভা গঠিত হইল। সম্পাদক হরলাল রায় সভার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ বিবৃত করেন :

"...বালিকাগণ বিদ্যালয়ে দুই তিন বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় যথাবাঞ্ছিত ফল উৎপন্ন হইতেছে না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে এইরূপ একটি প্রণালী কলিকাতার ব্রাহ্মবন্ধু সভা অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে নিযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি দ্বারা সুশিক্ষিত হইতে পারিবেক। পাঠের বিবরণ বর্ষে চারিবার উক্ত সভায় প্রেরণ করিতে হইবেক। বৎসরে দুইবার বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।..." (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ভাদ্র, ১৭৮৫ শক, পৃঃ ৮৩ ।

সভা এই প্রণালীর সমর্থনকারী অভিভাবকদের নিকট তাহাদের নাম, ধাম, ছাত্রীদের বয়স, পাঠ্য পুস্তক এবং পাঠে উন্নতি বিষয়েও সংবাদ চাহেন। সভা পক্ষে শিক্ষার্থিনীদিগের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া পাঠ্য পুস্তক ধার্য করা হইত। ১২৭১ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' সভা চারটি ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করেন। এই সনের শেষে ব্রাহ্মবন্ধু সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ভার বামাবোধিনী

সভার হস্তে অর্পণ করেন।

বামাবোধিনী সভা কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবক স্থাপন করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বসন্তকুমার ঘোষ (অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ) প্রমুখ যুব-নেতাদের দ্বারা 'বামাবোধিনী পত্রিকা' পরিচালনার নিমিত্ত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল মুলতঃ চারিটি: (১) এদেশীয় নারীগণের মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, (২) শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে রচনা-প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা, (৩) বাঙালী পরিবারসমূহে বয়স্থা স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন এবং (৪) নারীজাতির মঙ্গল উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার সাহায্যদান।

সভার আনুকূল্যে ১৮৬৩, আগস্ট (ভাদ্র, ১২৭০ বঙ্গাব্দ) হইতে উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রসিদ্ধ 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ আরম্ভ হয়। সভা 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র ভার লইয়া ইহার নানারূপ উৎকর্ষ সাধনেও যত্নপর হইলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'—আশ্বিন, ১২৭৪ সংখ্যায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁহাদের কার্যকলাপ এইরূপ বিবৃত করেন:

"...অনন্তর ১২৭১ বঙ্গাব্দের শেষে ব্রাহ্মবন্ধু সভা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রণালীর ভার বামাবোধিনী সভার হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি বামাবোধিনী সভা তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের পূর্বাবলম্বিত প্রণালীর সহিত তাহা একত্রিত করেন এবং ১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে বৈশাখ মাসে বামাবোধিনী পত্রিকার সভ্যদিগের অনুমিত পরীক্ষা পুস্তক সকলের একটি নূতন তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার সময় পাঁচ বৎসরে বিভক্ত করা হয়...। ১২৭০।১২৭১ এই দুই বৎসর ব্রাহ্মবন্ধু সভার হস্তে তাহার ভার থাকে এবং ১২৭২।৭৩।৭৪ এই তিন বৎসর উহা বামাবোধিনী সভার হস্তে আসিয়াছে।"

হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটি

এই বিষয়টি সম্বন্ধে বলিতে গেলে একটু পিছাইয়া যাইতে হয়। ডেভিড-হেয়ারের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে ১৮৪৪, ১লা জুন হইতে বাৎসরিক স্মৃতি-সভার অধিবেশন করা সাব্যস্ত হয়। এই বৎসর, ২৩শে জুন তারিখে 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড' নামে একটি ধনভাণ্ডার গঠিত হইল এবং ইহার ট্রাস্টী হইলেন রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ফণ্ড বা ভাণ্ডার হইতে প্রতি বৎসর কোন জনহিতকর বিষয়ের উপরে উৎকৃষ্ট বাংলা প্রবন্ধ রচয়িতাকে একটি করিয়া পুরস্কার দানের ব্যবস্থা হইল। প্রবন্ধ-পরীক্ষক থাকিতেন রামগোপাল ঘোষ, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইহার ফলে বাংলা ভাষায় বাল্যবিবাহের দোষ, স্ত্রীশিক্ষা, বাঙালীর শারীর-চর্চা, জাতীয় উন্নতি, বঙ্গের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ রচিত হয় এবং লেখকগণ পুরস্কার লাভ করেন। তারাশঙ্কর শর্ম্মা, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ ঘোষ, হরনাথ শর্ম্মা প্রমুখ ব্যক্তিগণ রচনায় প্রতিযোগিতা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড' দ্বারা এইরূপে কতকটা হিতসাধন হইত বটে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে প্রয়াসী হইলেন। ১৮৬৪ সনের ২০শে অক্টোবর একটি বিশেষ সভায় স্থির হয় যে, অতঃপর এমন একটি প্রবন্ধের জন্য আর পুরস্কার দেওয়া হইবে না। ইহার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় রচিত নারী পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট পুস্তকের নিমিত্ত লেখককে থোক টাকা দেওয়া হইবে। তবে এরূপ অর্থসাহায্যপ্রাপ্ত পুস্তকের মলাটে "হেয়ার প্রাইজ' লেখা থাকিবে। পুস্তক সমূহের পাণ্ডুলিপি বিচারের ভার দেওয়া হইল— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া গঠিত একটি কমিটির উপর।

সম্পাদক হইলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। ১৮৬৭ সনে রামগোপাল ঘোষ অবসর লইলে তৎস্থলে পরীক্ষক নিযুক্ত হন শিবচন্দ্র দেব। এই ফণ্ডের সাহায্যে প্রকাশিত অন্ততঃ পাঁচখানি পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ১ আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান— প্যারীচাঁদ মিত্র; ২ মহিমাবলী— গোপীকৃষ্ণ মিত্র; ৩ ও ৪ বামারচনাবলী ('বামাবোধিনী পত্রিকা' হইতে সংকলিত, —উমেশচন্দ্র দত্ত, ৫ প্রাণনাথ দত্ত চৌধুরী কৃত চারু ও কারুশিল্পের রীতিপদ্ধতি বিষয়ক একখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি।* হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটি স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনে, বিশেষ বয়স্থা স্ত্রীগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা প্রচারে কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা

১৮৬৪ সনের এপ্রিল মাসে কলিকাতার অনতিদূরে ব্যাপকতর উদ্দেশ্য লইয়া উত্তরপাড়া হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষা বিস্তার ব্যপদেশে, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টায় উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কার্যকলাপ সুবিদিত। এই সভা প্রতিষ্ঠার মূলেও তাঁহাদের আত্যন্তিক সহানুভূতি ছিল। সভার উদ্দেশ্য ছিল এইরূপ: দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা, দুর্গতদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান, দরিদ্র রোগীদের ঔষধ-পথ্য-প্রদান, বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুদের ভরণপোষণ, বঙ্গীয় সুরাপাননিবারণী সভার শাখাস্বরূপ মাদকদ্রব্য বর্জনে সহায়তা এবং সভার সভ্যদের উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক

* প্যারীচরণ মিত্রের ইংরেজী ডেভিড হেয়ারের জীবনীতে (পৃ ১১৬-২০) এই সম্বন্ধে বিশদ উল্লেখ আছে।

উন্নতিসাধন।* প্রথম প্রথম সভা উক্ত কার্যসমূহে মনঃসংযোগ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু অর্থসংস্থানের সংকীর্ণতা হেতু ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারেই অধিকতর অবহিত হইলেন। সভা-কর্তৃপক্ষ উত্তরপাড়ায় নিজেদের তত্ত্বাবধানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। এই বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে একটি মর্ম্মন্তুদ কাহিনী আছে। মিস্ মেরী কার্পেন্টারকে সঙ্গে লইয়া পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৬৬ সনের ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করিতে যান। কলিকাতায় ফিরিবার পথে পথিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বগি উল্টাইয়া গিয়া যকৃতে ভীষণ আঘাত পান। এই আঘাতের ফল তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভোগ করিতে হয়। শেষে যকৃৎ-সংক্রান্ত ব্যাধিতেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

প্রথমে হাওড়া ও হুগলীতে, এবং পরে সমুদয় বর্দ্ধমান বিভাগে হিতকরী সভা প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা প্রতি বৎসর জেলার বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষার আয়োজন করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কবি কামিনী রায় হুগলী স্কুল হইতে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইয়া হিতকরী সভার বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে উত্তরপাড়া হিতকরী সভার কার্যকলাপের সপ্রশংস উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৬৪-৬৫ সনের

---

*The great objects of the Hitokorry Shova are to educate the poor, to help the needy, to clothe the naked, to give medicines to the indigent sick, to support poor widows and orphans, to promote the cause of temperance as a branch of the Bengal Temperance Society, and to ameliorate the social, moral and intellectual condition of the members themselves and of their fellow inhabitants of Ooterperah and its vicinity"—*Six Months in India* (Vol. I) by Mary Carpenter, p. 242.

রিপোর্টে এই মর্মে লিখিত হইয়াছে যে, হিতকরী সভা প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই হাওড়া ও হুগলীর বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীদের ১৮৬৫, ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা গ্রহণ এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের মাসে দুই টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য আটটি বৃত্তি দিবার মনস্থ করেন। ১৮৬৬-৬৭ সনেই সরকারী শিক্ষা রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বর্ধমান বিভাগে উত্তরপাড়া হিতকরী সভাই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে কর্মরত প্রধান প্রতিষ্ঠান।*

সভার কার্যক্রম শুধু বালিকা-বিদ্যালয়ের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না, বয়স্থা নারীদের শিক্ষার নিমিত্ত সভা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার আয়োজনও করেন। উত্তরপাড়া নিবাসী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পত্তি হিতকরী সভাকে দান করিয়া যান। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় প্যারী-মোহন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরকারী কর্মে লিপ্ত ছিলেন। শতাধিক সিপাহীর সঙ্গে একাকী লড়িয়া তিনি "Fighting Munsif" আখ্যা লাভ করেন। তিনি বহু বৎসর হিতকরী সভার সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা

এদেশের সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা প্রণালী—উচ্চশিক্ষা, লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি, স্বাস্থ্য, আধি-ব্যাধি, আইন-কানুন, আমোদ-প্রমোদ, ভাষা-সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, অপরাধ ও অপরাধী, অল্পবয়স্ক অপরাধী, কারাগার ও কারাবিধি, কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা— এক কথায় জীবনের সমগ্র দিক লইয়া

* **"The chief authority on the subject of female education in the Burdwan division is the Hitakari Sabha"—*Report on public Instruction* for 1876-77, p. 269.**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আলোচনা-গবেষণা পরিচালনের উদ্দেশ্যেই বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভারা আবির্ভাব। পূর্ব পূর্ব সভা হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, এখানে বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনার সুযোগ ছিল। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে একটু ইতিহাস আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বড়বাজারস্থ গার্হস্থ্য-সাহিত্য সমিতিতে পাদ্রী লঙ্ সমাজ-বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রতিপাদন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন ঐ সমিতির নবম বার্ষিক অধিবেশনে (২৭শে এপ্রিল ১৮৬৬)। বক্তৃতায় পাদ্রী লঙ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ব্রিটেনের সমাজ-বিজ্ঞান সভার আদর্শে-বঙ্গদেশে একটি সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। বিলাতের সভার উদ্দেশ্য—সামাজিক ব্যবস্থা প্রণয়ন, সমাজে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যনীতির প্রচার, অপরাধের প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের সংশোধন।

মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ষষ্ঠ দশকে এই সভার নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন, এবং সমাজ-সংস্কার কল্পে, বিশেষতঃ তরুণ ও বয়স্ক অপরাধীদের সম্পর্কে সুব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারকে অনুপ্রেরিত করিতে সক্ষম হন। কলিকাতার ক্ষেত্র আগেই কতকটা প্রস্তুত ছিল। মিস্ কার্পেণ্টার ১৮৬৬ সনের ২০শে নবেম্বর এখানে পৌঁছেন। তাঁহার ভারতবর্ষ-পরিভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—নারীজাতির উন্নতিসাধন এবং স্ত্রীশিক্ষার দ্রুততর-প্রসারের আয়োজন। কলিকাতায় আসিবার পর তিনি উক্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এখানে যাহাতে একটি সমাজ-বিজ্ঞান অনুশীলন কেন্দ্র স্থাপিত হয় সেদিকেও মন দিলেন। তাঁহারই আহ্বানে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ভবনে ১৮৬৬, ১৭ই ডিসেম্বর উক্ত উদ্দেশ্যে একটি সভা হইল। ভারতের বড়লাট,

† ইংরেজী নাম—"The Bengal Social Science Association."

ছোটলাট, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মী এবং দেশী-বিদেশী বেসরকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করেন। বিলেতের সভার নাম—"National Association for the Cultivation of Social Science in Great Britain।" মিস্ কার্পেণ্টার এই সভার শাখাস্বরূপ বঙ্গদেশে একটি সভা স্থাপনের আবশ্যকতা বিশদরূপে বিবৃত করিলেন। সভায় একটি অস্থায়ী কর্মী-সমিতি গঠিত হইল। নিয়মাবলী রচনার ভার পড়ে ডবলিউ. এস্ সীটন-কার, পাদরী লঙ্ এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের উপর।

নিয়মাবলী রচিত হইলে ১৮৬৭ ২২শে জানুয়ারি মেট্‌কাফ হলে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইল। নিয়মপত্র যথারীতি গৃহীত হইবার পর কলিকাতায় বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভাতেই ইহার প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হইলেন ডব্‌লিউ. এস্. সীটনকার এবং সম্পাদক হইলেন এইচ. বিভার্লি. সি.-এস্, ও প্যারিচাঁদ মিত্র। প্রথম দিকে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ায় সভার কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সভাপতি সীটন-কারও ছিলেন। তাঁহার স্থানে সভাপতি হন হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি জে. বি. ফীয়ার। অধ্যক্ষ-সভায় গণ্যমান্য ইংরেজ ও বাঙালী স্থান পাইয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার উদ্দেশ্য নির্ণীত হইল—'to promote the development of social science in the Presidency of Bengal' অর্থাৎ বঙ্গ প্রদেশে সমাজ-বিজ্ঞান অনুশীলনে উন্নতি সাধন। সভার নিয়মপত্রে বিভিন্ন অধিবেশনে অভিজ্ঞতাপূর্ণ ও গবেষণালব্ধ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ এবং সেই সকল প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশের কথা থাকে। এই নিয়ম অনুসারে সভা কর্তৃক দশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ সাত খণ্ড প্রবন্ধ পুস্তক কার্যবিবরণী সমেত মুদ্রিত হয়। সমাজ-উন্নয়ন-

মূলক কতবিধ দিকে যে সভ্যগণ মন নিবিষ্ট করিয়াছিলেন এই সকল দৃষ্টে তাহা সম্যক্ অনুভূত হয়। আবদুল লতীফ খাঁ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, লালবিহারী দে, কৈলাসচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, শ্যামাচরণ সরকার প্রমুখ মনীষিগণ এখানে আইন-কানুন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, পাল-পার্বণ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়াদি সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সমাজ-বিজ্ঞান সভার কর্ম-প্রণালী চারিটি বিভাগে বিভক্ত হয়— (১) ব্যবহার-শাস্ত্র, (২) শিক্ষা, (৩) স্বাস্থ্য এবং (৪) অর্থনীতি ও বাণিজ্য। উপরোক্ত এবং আরও অনেক মনস্বী ব্যক্তি বিভিন্ন বিভাগে নিজ নিজ গবেষণার কথা বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বহু ইউরোপীয়ও এই সকল শাখাভুক্ত হইয়া প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। ইহাদের মধ্যে পাদ্রী লঙ, জে. বি. ফীয়ার, জে. এফ. মৌএট এবং রবার্ট নাইটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সভা তিনজন অনারারী মেম্বার বা সম্মানিত সদস্য নিয়োগ করেন, ১৮৭০ সনে— মিস মেরী কার্পেণ্টার, মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও জে. বি. ফীয়ার। কুমারী কার্পেণ্টারের ন্যায় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলও ভারতবর্ষের বিশেষ হিতকামী বান্ধব ছিলেন। তিনি সভার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র দ্বারা যোগরক্ষা করিতেন। সভাকে অর্থ দিয়াও তিনি সাহায্য করেন। সম্মানিত সদস্য নিযুক্ত হইবার পর, 'On Indian Sanitation'—ভারতে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান (২৪শে জুন, ১৮৭০-এর একখানি পত্র সহ)। ইহা সভার প্রবন্ধ পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কুমারী কার্পেণ্টার ১৮৭৫ সনের শেষে একবার এদেশে আসেন। তিনি ১৮৭৫, ১৮ই ডিসেম্বর "Prison discipline and reformatory schools"—'কারাগারের নিয়মশৃঙ্খলা' এবং 'সংশোধন বিদ্যালয়' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

মৌলবী আবদুল লতীফ খাঁ ১৮৬৮ সনের ৩০শে জানুয়ারি মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সার সৈয়দ আহমদের বহু পূর্বে তিনি এ বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের পদত্যাগের (১৮৭৩) পর ইনিই সভার সম্পাদক পদে ব্রতী হন। স্ত্রীজাতির উন্নতি এবং স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন ও চন্দ্রনাথ বসু, বাঙালীর সাহিত্য এবং পাল পার্বণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে লালবিহারী দে এবং ইংরেজী শিক্ষার উপর কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রবন্ধসমূহ এখনও পাঠ করিলে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান মিলিবে, যাহা অন্য কোথায়ও পাওয়া কঠিন। সভার শিক্ষা শাখায় কেশবচন্দ্র সেন এবং অর্থনীতি ও ব্যবসা শাখায় প্যারীচাঁদ মিত্র সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পাদ্রী লঙের বাংলা প্রবাদ সাহিত্য, বোম্বাই ও কলিকাতার দেশীয় সমাজ এবং রাশিয়া ও ভারতবর্ষের গ্রাম-সংস্থা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা-প্রবন্ধ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। সভায় উথাপিত আলোচনা বহু বিষয় সমাজোন্নয়নের দিগ্‌দর্শন হয়। *

ভারত-সংস্কার সভা
(The Indian Reform Association)

আমরা ইতিমধ্যেই কেশবচন্দ্র সেনের নামোল্লেখ করিয়াছি। তিনি শুধু ধর্মনেতা বা নিছক সমাজ-সংস্কারকই ছিলেন না, ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি ১৮৭০ খৃস্টাব্দে সাত মাস বিলাতে অবস্থান করিয়া অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেখানকার জনহিতকর কার্যাবলীর সঙ্গেও পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

* বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা সম্বন্ধে বর্তমান লেখক 'প্রবাসী'—কার্তিক, পৌষ, চৈত্র ১৩৬২-বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

সেখান হইতে ১৮৭০, ২০শে অক্টোবর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কালবিলম্ব না করিয়া সহকর্মী ও বন্ধুদের সহিত পরামর্শে লিপ্ত হইলেন। পরবর্তী ২রা নবেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া কেশবচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন করেন। সভার উদ্দেশ্য খুবই ব্যাপক—'to promote the social and moral reformation of India'—ভারতবর্ষের সামাজিক এবং নৈতিক সংস্কার সাধন। সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং। সম্পাদক গোবিন্দচন্দ্র ধর। দ্বিতীয় বৎসরে 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সভার যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন।

উক্ত ব্যাপক উদ্দেশ্য কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য সভা পাঁচটি শাখা বা বিভাগে বিভক্ত হইল। এই শাখাগুলি যথাক্রমে—(১) স্ত্রীজাতির উন্নতি (Female improvement), (২) শ্রমজীবীদের শিক্ষা এবং কারিগরি বিদ্যালয় (Education of the working classes and technical education), (৩) সুলভ সাহিত্য (Cheap literature) (৪) মাদক দ্রব্য নিবারণ (Temperance) এবং (৫) দাতব্য (Charity) পাঁচটি বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক হইলেন যথাক্রমে (১) উমেশচন্দ্র দত্ত, (২) জয়কৃষ্ণ সেন (দ্বিতীয় বর্ষে অমৃতলাল বসু ও কৃষ্ণবিহারী সেন), (৩) উমানাথ গুপ্ত, (৪) যাদবচন্দ্র রায় (২য় বর্ষে কানাইলাল পাইন) এবং (৫) কান্তিচন্দ্র মিত্র। এই পাঁচটি বিভাগেই যথারীতি কার্য আরম্ভ হইল। প্রত্যেকটি শাখার কার্যকলাপের কিছু কিছু ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া যাইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই সভার সভ্য হইতে পারিতেন।

স্ত্রীজাতির উন্নতি : এই বিভাগের অন্তর্গত একটি শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল ১৮৭১ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি। ইহার অধীনে

একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। তৎকালীন বালিকা-বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ অভাব থাকায় ছাত্রীদের শিক্ষায় খুবই ব্যাঘাত হইত। এই অভাব মিটাইবার জন্যও কেশবচন্দ্র শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। পাঠ্যতালিকাও নির্দিষ্ট হইল। ইংরেজী, বাংলা, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে পাঁচটি শ্রেণীতে পড়াইবার বিধি হইল। অধ্যাপনার কার্যে রত ছিলেন 'দত্ত-গৃহিণী', মিস নিকলসন, মিস্ উইন্স, মিস মুখার্জী এবং পরবর্তীকালের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি— বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়। কেশবচন্দ্রও স্বয়ং মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে উপকারী কতকগুলি বিষয় অতি সহজ ভাষায় ছাত্রীদের বুঝাইয়া দিতেন। শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় প্রথম পটলডাঙ্গায় স্থাপিত হইয়াছিল। স্থানাভাব হেতু বেলঘরিয়া ও কাঁকুড়গাছিতে পরপর স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭২ সনের মাঝামাঝি আবার কলিকাতায় লইয়া আসা হইল। বিদ্যালয়টি তখন ভারত-আশ্রমের* অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এ যাবৎ শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের ব্যয় সমুদয়ই ব্যক্তিগত চাঁদার দ্বারাই নির্বাহিত হইয়াছিল। এরূপ একটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বাংলা সরকার ১৮৭২, ৯ই আগস্ট ইহাকে বার্ষিক দুই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ভারত-সংস্কার সভার স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের মুখপত্র হইল। বিভাগীয় সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন এই পত্রিকাখানিরও সম্পাদক।

* কেশবচন্দ্র সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ভারত আশ্রম সম্বন্ধে আনুপূর্বিক বিবরণ বর্তমান লেখকের "বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারত-আশ্রম" প্রবাসী-(আষাঢ় ১৩৫৭), প্রবন্ধেদ্রষ্টব্য

শ্রমজীবিদের শিক্ষা এবং কারিগরি বিদ্যালয় : এই বিভাগের কার্যও আরম্ভ হয় ১৮৭০,২৮শে নবেম্বর। কলিকাতা—কলুটোলাস্থ কেশব-ভবনে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল। শ্রমজীবিদের ইংরেজী ও বাংলা, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কারুশিল্প শিক্ষাদান এই বিভাগের কার্য। বিদ্যালয়ও হইল দুইটি। প্রথমটি নৈশ, দ্বিতীয়টি প্রাতঃকালীন। নৈশবিদ্যালয়ে কারিগর, দোকানদার, ভৃত্য প্রভৃতিকে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করিয়া ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইত। কারিগরি বা শিল্প বিদ্যালয়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ভদ্রশ্রেণীর লোকদের ছুতারের কাজ, সেলাই, ছবি আঁকা, ঘড়ি মেরামতি, মুদ্রণকার্য, লিথোগ্রাফি ও এন্‌গ্রেভিং বা তক্ষণকার্য শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের সামান্য কিছু বেতন দিতে হইত। দ্বিতীয় বর্ষে এই বিভাগ 'ক্যালকাটা স্কুল' নামে একটি সাধারণ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নিয়ম শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাদানও এ বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। প্রথম বর্ষেই বিদ্যালয়টি স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছিল। এই বিদ্যালয়টি পরে অ্যালবার্ট স্কুল ও কলেজে পরিণত হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অ্যালবার্ট স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

সুলভ সাহিত্য : ভারত-সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুলভ সাহিত্য বিভাগের কার্য আরম্ভ হয়। এই বিভাগ ১লা অগ্রহায়ণ (১৫ নবেম্বর, ১৮৭০) হইতে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিতে সুরু করেন। এখানির নাম ছিল—'সুলভ সমাচার'। ইতিপূর্বে এক পয়সায় এরূপ সুসম্পাদিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশের পরই পত্রিকাখানি জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। প্রথম দুই মাসের মধ্যে 'সুলভে'র প্রচার-সংখ্যা আট হাজার দাঁড়ায়। প্রকাশের পর প্রথম চৌদ্দ মাসে (নবেম্বর ১৮৭০—ডিসেম্বর ১৮৭১) ইহা প্রচারিত হয় ২,৮১,১৪৯ খানি। আজিকার দিনে বিস্ময়কর

না ঠেকিলেও সেযুগে ইহা খুবই একটা বিস্ময়ের বিষয় ছিল। 'সুলভ সমাচারে'র কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহার জন্য সেযুগে এখানি এতটা জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমত, ইহার মূল্য মাত্র এক পয়সা, দ্বিতীয়ত, অতি সহজ সরল ভাষায় এখানিতে সংবাদ ও সম্পাদকীয় পরিবেশিত হইত। এ হিসাবে পরবর্তীকালের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সন্ধ্যা'র ইহা অগ্রজ। তৃতীয়ত, বাঙালী জীবনের সমস্যা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ঢাক্ ঢাক্ গুর্ গুর্ না করিয়া সোজা করিয়া সোজা কথায় দেখানো হইত। বাংলা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে সুলভ সমাচারই মনে হয় সকলের আগে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণের কথা সাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছিল। শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশেও 'সুলভ সমাচার' বাংলা সংবাদপত্রসমূহের পথপ্রদর্শক। আমি অন্যত্র এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

মাদকদ্রব্য নিবারণ: এই বিভাগের উদ্দেশ্য— সুরাপান ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য পান হইতে যাহাতে লোকে বিরত থাকে এরূপ পুস্তক প্রকাশ, বক্তৃতা দান, ইহা দ্বারা যে যে ভয়ানক পাপ বৃদ্ধি পাইতেছে তদ্বিষয়ে সাধারণের নিকট প্রচার করা এবং ইংলণ্ডের সুরাপান নিবারণী সভার সঙ্গে যোগ রাখিয়া তাহার সাহায্য করা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত দশকেই প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে একটি সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (২৪মে ১৮৬৪)। 'ওয়েল উইসার' এবং 'হিতসাধক' নামক ইংরেজী-বাংলা দুইখানি পত্রিকা প্যারীচরণের সম্পাদনায় আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল। মাদকদ্রব্য নিবারণ বিভাগের মুখপত্রস্বরূপ বাংলায় 'মদ না গরল' নামে একখানি মাসিকপত্র ১৮৭১ সনের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 'আত্মচরিতে' এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, উক্ত বিভাগের আনুকূল্যে তিনি এখানি বাহির করেন। ইহা সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন

করিত, গন্থ পন্থময় প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইত। সে সমুদয়ের অধিকাংশ তিনি লিখিতেন। ভারত-সংস্কার সভা কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে এই বিভাগ মারফত সুরাপান এবং মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। সভার চেষ্টা-যত্নে বহুজনের স্বাক্ষর সম্বলিত একখানি আবেদন-পত্র বড়লাটের নিকট প্রেরিত হয়, যাহাতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ, কিংবা অন্তত সঙ্কুচিত হয়। ইহাতে খানিকটা কাজও হইয়াছিল। ভারত-সরকারের আদেশে সুরা ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিক্রয় কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দাতব্য: এই বিভাগের করণীয় ছিল—দরিদ্র ও নিঃসম্বল ছাত্রদের বেতন এবং পুস্তক দিয়া বিদ্যাশিক্ষায় সহায়তা, অন্ধ-খঞ্জ-বধিরকে আর্থিক সাহায্য, বিধবা, পিতৃহীন শিশু ও দুঃস্থ ভদ্র পরিবারকে নিয়মিত মাসিক বৃত্তি দান এবং অনাথ আতুরকে ঔষধপথ্যাদি বিতরণ। ১৮৭১ সনের জুলাই মাসে বেহালা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মারাত্মক জ্বররোগের প্রাদুর্ভাব হয়। দাতব্য বিভাগ তৎক্ষণাৎ সেখানকার রোগীদের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিভাগের পক্ষে মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই সময় সেবাকার্যে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে দাতব্য বিভাগ দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের যথাক্রমে ৫০০৲ ও ৪৭৪৲ সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই পাঁচটি বিভাগ ছাড়া ভারত-সংস্কার সভা আরও কতকগুলি কার্যে হস্তক্ষেপ করে, যেমন পতিতাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং অশ্লীল চিত্রাদি বিক্রয় ও জুয়াখেলা নিবারণ প্রভৃতি। হিন্দু বালিকাদের বিবাহ-যোগ্য বয়স নির্ধারণকল্পে এই সভার প্রয়াস আজিকার দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১৮৭২ সনের ১লা এপ্রিল হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিখ্যাত ডাক্তারের

মত চাওয়া হয়। বারজন ডাক্তার এ বিষয়ে মত দেন। তাহাতে দেখা যায়, বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৪ এবং সর্বউচ্চ বয়স ২১ বলিয়া কেহ কেহ মত দেন। এই সনেই কেশবচন্দ্র পরিচালিত আন্দোলনের ফলে বিবাহ আইন 'তিন আইন' নামে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। তবে ডাক্তারদের নিকট হইতে মতামত পাওয়া যায় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিবাহের নিম্নতম বয়স ষোল এবং ডাঃ সূর্যকুমার (গুডিব) চক্রবর্তী নিম্নতম বয়স ১৬ এবং উচ্চতম বয়স ২১এর পক্ষে মত দিয়াছিলেন। ভারত-সংস্কার সভার তথ্যাদি ইংরেজী বার্ষিক রিপোর্ট হইতে প্রাপ্ত।

বামাহিতৈষিণী সভা

এই সভাটি কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় ভারত-সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের বয়স্থা ছাত্রীগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১৮৭১ খৃস্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল তারিখে। ইহার সভাপতি পদে বৃত হন কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদিকা হন শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিড়ী। 'স্ত্রীজাতির উন্নতি' বিভাগের মুখপত্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা' আশ্বিন ১২৭৭ বঙ্গাব্দেই বয়স্থা নারীদের এইরূপ একটি সভার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। সভা প্রতিষ্ঠার পর বৈশাখ ১২৭৮ (১৮৭১) সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা' ইহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে লেখেন :

"ভারত-সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে এবং শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের উৎসাহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা। বামাগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধান করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুইবার হইবে। সকল জাতি এবং সকল ধর্মাক্রান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য

হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। সভাস্থলে স্ত্রী-জাতির হিতজনক রচনা পাঠ, বক্তৃতা ও কথোপকথন হইবে। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের স্ত্রী বিবি ফিয়ার দর্শক হইয়া আসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভাকার্য নির্বাহ করেন। প্রথমতঃ, বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। এবং তাহাতে তাহাদের শরীর, মন ও আত্মা এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, বিদ্যা ও ধর্ম সাধন না হইলে পূর্ণ উন্নতি সাধন হইবে না, সুন্দররূপে প্রদর্শন করেন। পরে তাঁহার চারিটি ছাত্রী সেই বিষয়ে রচনা পাঠ করিলেন। কেশবচন্দ্র বিবি ফিয়ারকে এই সকল বিষয় ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভ্যশ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিতে বলিলেন। কুমারী পিগট, ব্যারিস্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু দুর্গামোহন দাসের পত্নীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন।"

সভার প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সম্বৎসর ধরিয়া কি কি বিষয় আলোচনা হইয়াছিল তাহার এক একটি ফিরিস্তি পাওয়া যাইতেছে। প্রথম বৎসরে—১ প্রকৃত শিক্ষা, ২ প্রকৃত স্বাধীনতা, ৩ স্ত্রীলোকদিগের নিরুদ্যম ও উৎসাহহীনতা, ৪ লজ্জা, ৫ বিনয়, ৬ অভ্যর্থনা, ৭ সভ্যতা, ৮ পরিবহন, ৯ নম্রতা, ১০ অত্যাচার ১১ ক্রোধ, ১২ গৃহকার্য, ১৩ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, ১৪ হিংসা, ১৫ ভগ্নীভাব, ১৬ দয়া— এই কয়টি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় বৎসর আলোচনা হয়—১ পুরাকালের হিন্দু ও বর্তমানকালের সুসভ্য ইংরেজ রমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়, ২ সন্তান পালন, ৩ দয়া, ৪ আদর্শ রমণী, ৫ বঙ্গীয় রমণীদিগের বর্তমান

অবস্থা এবং তাঁহাদিগের প্রতি ইংলণ্ডীয় রমণীদিগের কর্তব্য, ৬ নারীগণের ধর্মহীন শিক্ষা অনুচিত কিনা, কি প্রকার শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র উন্নতি হইতে পারে এবং ৭ নারীজীবনের উদ্দেশ্য। বামাহিতৈষিণী সভার সদস্যাদের মধ্যে নিম্নলিখিত মহিলাগণও ছিলেন—রাজলক্ষ্মী সেন, সৌদামিনী খাস্তগীর, সৌদামিনী মজুমদার, যোগমায়া গোস্বামী, সারদাসুন্দরী ঘোষ, বিধুমুখী মুখোপাধ্যায়, সরলাসুন্দরী দাস, সুশীলাসুন্দরী দাস, জগত্তারিণী বসু, ভবতারিণী বসু, কৃষ্ণবিনোদিনী বসু, জগমোহিনী রায, কৈলাসকামিনী দত্ত, অন্নদায়িনী সরকার, কৃষ্ণকামিনী দেব এবং মহামায়া বসু।

বামাহিতৈষিণী সভা ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইহার কার্য বেশীদিন চলে নাই। ১৮৭৯ সালের মে মাসে কেশবচন্দ্র সেনের অনুবর্তীরা 'আর্যনারী সমাজ' এবং তাঁহার বিপক্ষ দল—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃবর্গ ১৮৭৯, আগস্ট মাসে 'বঙ্গ মহিলাসমাজ' প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দুইটি মহিলা সভাও দীর্ঘকাল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমাজ সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।*

* * * *

সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতি সপ্ত দশকে নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিস্তার লাভ করে। হিন্দু মেলার আবির্ভাব ষষ্ঠ দশকের শেষে হইলেও এই দশকেই ইহার জাতীয় ভাবসঞ্চারী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে সুরু হয়। সংস্কৃত সাহিত্য, বাংলা তথা প্রাদেশিক ভাষা-সাহিত্য, স্বদেশীয় শিক্ষা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চারু ও কারু শিল্প,

* বামাহিতৈষিণী সভার তথ্যাদি ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশনের বাৎসরিক রিপোর্টগুলি এবং বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে সংগৃহীত। এ সম্বন্ধে লেখকের "বামাহিতৈষিণী সভা ও ভারতআশ্রম প্রবন্ধে প্রবাসী আষাঢ় ১৩৫৭ দ্রষ্টব্যঃ)।

ব্যায়াম চর্চা, চিকিৎসা প্রণালী, জাতীয় ভাবোদ্দীপক কাব্য-নাটক রচনা, বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র সম্পাদন, জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা, শিল্প উন্নয়ন প্রভৃতির দিকে নব্যশিক্ষিতেরা বিশেষ ভাবে মনঃ-সংযোগ করেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, শিশিরকুমার ঘোষ তথা ইণ্ডিয়ান লীগের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত অ্যালবার্ট টেম্পল অফ সায়ান্স বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চার পথ খুলিয়া দিল। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সামান্যতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার সূচনা হয়। বিদ্বজ্জন-সমাগম, সারস্বত সমাজ প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যানুশীলন প্রতিষ্ঠান নবম দশকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ত্রিশ বৎসরের ভিতরে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা দ্বারা নব্য শিক্ষিতেরা বাংলা তথা ভারতবর্ষের রেনেসাঁ সম্ভব করিয়া দিয়াছে।

লেখকের অন্যান্য বই

বাংলার উচ্চশিক্ষা

"উচ্চশিক্ষা বলিতে যোগেশবাবু ইংরেজি শিক্ষা বুঝাইয়াছেন। বাংলাদেশে প্রথমে ইংরেজি শিক্ষা বেসরকারী ভাবে শুরু হয়। পরে সরকার নিজ স্বার্থে তাহার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। সরকারী ও বেসরকারী বহু স্কুলকলেজ ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের শিক্ষানীতিও যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৮৩৫ সনে শিক্ষার বাহন ইংরেজি ধার্য করা এবং ১৮৪৪ সনে ইংরেজি শিক্ষিতদের উচ্চ সরকারী কর্মে নিয়োগের ঘোষণা—এই দুইটি ঘটনা ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে যুগান্তর আনিয়াছিল বলা যায়। আবার এই শিক্ষাব্যপদেশে আমাদের দেশে নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার ফলে আধুনিক ভাবধারার ভিত্তিতে আমরা ক্রমশ স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠি। যোগেশবাবু বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশে এই সকল কথা অতি সুন্দর ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আমাদের মধ্যে স্বভাবতই একটা বিরাগ আসিয়াছে। কিন্তু প্রথম যুগে এই শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ ছিল, আর, ইহার দৌলতে আমরা কতখানি উপকৃত বা অপকৃত হইয়াছিলাম তাহারও হিসাব-নিকাশ করিয়া দেখা দরকার।"

—যুগান্তর

বাংলার জনশিক্ষা

"অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত, বাংলার জনশিক্ষার ক্রমবিবর্তনের তথ্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলার স্ত্রী-শিক্ষা

"বাংলার প্রথম স্ত্রী-শিক্ষার সূত্রপাত কেমন করিয়া হয় তাহার চিত্তাকর্ষক কাহিনী। বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।"

—যুগান্তর

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী

"ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সূচনা বাংলাদেশ থেকেই হয়েছিল এই কথা শুধু বাঙালীর স্বদেশপ্রীতির কথা নয়, ইহা ইতিহাস-সম্মত কথা। যাঁরা জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অবগত আছেন তাঁরা সকলেই জানেন কেমন করে কালক্রমে ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েশন ন্যাশনাল-কনফারেন্স হতে ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হয়। তার মধ্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের দান যথেষ্টই ছিল। তবু অস্বীকার করা যায় না যে, তার মধ্যে বাংলার নেতৃবৃন্দই সকলের পুরোভাগে ছিলেন। এ কথা ইতিহাসের কথা। এই ইতিহাস নানা গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রিকার পাতায় ছড়ানো আছে। কিন্তু এই আন্দোলনে বাংলার নারীরাও যে গোড়া থেকেই অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন তার ইতিহাস আমাদের সবিশেষ জানা ছিল না। বস্তুত, শুধু গোড়ার যুগেই নয়, বাংলার নারীরা জাতীয় আন্দোলনে বরাবরই অংশ গ্রহণ করে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে নেত্রীদের নাম সকলেই জানেন। কিন্তু শুধু নেত্রীদের কথা জানাই যথেষ্ট নয়, বাংলার বিস্তৃত নারীসমাজের সর্বত্রই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, যা আজও বহুলাংশে লোক-চক্ষুর অগোচরে রয়ে গিয়েছে; সিউড়ির দুকড়িবালা ওরফে সিন্ধুবালা সানন্দে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নিলেন, স্বামীর কাছে ছোট ছোট ছেলেদের রেখে জেল খাটতে গেলেন; বরিশালের সরোজিনী বসু বন্দেমাতরম্ ধ্বনির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত ডান হাতে বালা পরবেন না প্রতিজ্ঞা করে হাতের বালা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন; কলসকাঠি গ্রামে মহিলারা প্রতিজ্ঞা করেন, বঙ্গবিভাগ রহিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা গৈরিক বসন পরবেন। এই সব ঘটনা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে নিহিত রয়েছে।

কংগ্রেসের একেবারে গোড়ার যুগ হতে স্বাধীনতালাভের সময় পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কাহিনী এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এরূপ স্বল্পপরিসরে এত তথ্য এবং এমন একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে পারায় লেখক পাঠকসমাজের প্রভূত ধন্যবাদ অর্জন করবেন।"

—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। প্রবাসী